নিকোলাই মেকিয়াভেলি

দ্য প্রিন্স

অনুবাদ

বদিউর রহমান

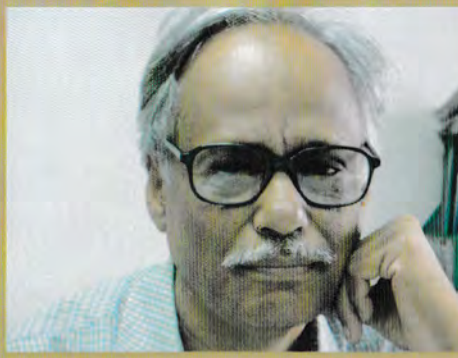

বদিউর রহমান। জন্ম ১৯৪৭, পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়ায় মাতুলালয়ে। বাবা হাবিবুর রহমান, মা ওজিবুননেসা খানম। পৈত্রিক নিবাস ভাণ্ডারিয়ার বোথলা গ্রামে। বেড়ে ওঠা বরিশাল শহরে। অধ্যাপক ও সাংবাদিক। ১৯৬৮-তে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপনায় যোগদান। অবসর গ্রহণ জানুয়ারি ২০০৪-এ।

কাজ করেছেন সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে। লিখেছেন 'সাহিত্য স্বরূপ', 'সাহিত্য-সংজ্ঞা অভিধান', 'ছন্দ অলঙ্কার রস-তত্ত্ব'। এই সূত্র ধরেই প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্য-তত্ত্ব সন্ধান। অনুবাদ করেছেন 'প্লেটোর কাব্য-ভাবনা', 'এরিস্টটলের পোয়েটিকস', 'হোরেসের আর্স পোয়েটিকা' এবং 'লঙ্গিনাসের সাহিত্য-তত্ত্ব'। এই চার যুগন্ধর পণ্ডিতের সাহিত্য-তত্ত্ব সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'ধ্রুপদী সাহিত্য-তত্ত্ব'।

অনুবাদ করেছেন এম এন রায়ের 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' ও 'নয়া মানবতাবাদ'; র‍্যালফ ফক্স-এর 'উপন্যাস ও জনগণ'; ইএম ফরস্টারের 'উপন্যাসের যত বিষয়'; 'রোঁমা রোঁলার গণনাট্য' ইত্যাদি গ্রন্থ। গবেষণা করেছেন চারণকবি মুকুন্দদাস নিয়ে। লিখেছেন 'বাংলার চারণ মুকুন্দদাস' গ্রন্থ। লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন বেশ কয়েকটি গ্রন্থ। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৭। এখনো নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে।

নিকোলাই মেকিয়াভেলি

❁ ডাক্তাররা বলেন কোনো রোগের সূচনাতে চিকিৎসা যত সহজ, রোগ বেড়ে গেলে বা গেড়ে বসলে তা অত সহজ নয়। রোগ পুরনো হলে তাকে জানা যায় সহজে কিন্তু চিকিৎসা হয়ে পড়ে কঠিন।

❁ মানুষ তার পিতার মৃত্যুশোক যত সহজে ভুলতে পারে, পৈত্রিক সম্পত্তি হারানোর শোক অত সহজে ভুলতে পারে না।

❁ মানুষ ভালোবাসে নিজের মুক্তচিন্তায় আর ভীত হয় শাসকের ইচ্ছায়।

❁ সিংহ ফাঁদের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না; আর শৃগাল পারে না নেকড়ের থাবা থেকে নিজেকে বাঁচাতে।

❁ মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি যে, ভালো আবহাওয়ায় কখনো ঝড়ের কথা ভাবে না।

❁ ভাগ্য হলো স্ত্রীলোকের মতো। যদি তাকে বশে আনতে চাও তাহলে ঝাপিয়ে পড়ো এবং আঘাত করো। দেখবে সে শক্তিধর বলবানদেরকেই সহজে নিজের ওপর প্রভুত্ব করতে দেয়, দুর্বল এবং শান্তদেরকে নয়।

❁ ঈশ্বর সব কিছু করে দেবেন না। কারণ তা হলে আমাদের স্বাধীনচিন্তা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো আর যা আমাদের গৌরবের অর্জন তারও ভাগিদার হবেন তিনি (ঈশ্বর)।

❁ যিনি জনগণের উপর নির্ভর করেন তিনি চোরাবালির উপর ঘর বাঁধেন।

দ্য প্রিন্স
নিকোলো মেকিয়াভেলি
অনুবাদ: বদিউর রহমান

প্রকাশক
শিহাব বাহাদুর
মুক্তচিন্তা
৭৪ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা ১২০৫
মোবাইল : ০১৭২০৬৩৫৭৮৭, ০১৬৭৬৬২১৩৪৪
ই-মেইল : muktochinta789@yahoo.com

প্রকাশকাল
ভাদ্র ১৪২২
আগস্ট ২০১৫

© অনুবাদক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

মুদ্রণ
ত্রয়ী প্রিন্টার্স
১৫ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা

মূল্য
২৫০ টাকা

ISBN : 978 - 984 - 91311 - 7 - 5

THE PRINCE By Niccolò Machiavelli, Translated by Badiur Rahman, Cover Design : Mostafiz Karigor, Date of Publication: August 2015, Published by Muktochinta, 74 Concord Emporium, 253-254 Elephant Road, Katabon, Dhaka 1205.

Price Taka 250 US $ 10

ভূমিকা

বিশ্বখ্যাত দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, ইতিহাসবিদ এবং মানবতাবাদী লেখক মেকিয়াভেলির জন্ম ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ মে ইতালির ফ্লোরেন্স নগরীতে। পুরো নাম নিকোলো ডি বার্নাডো ডে-ই মেকিয়াভেলি। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন ৫৮ বছর বয়সে ফ্লোরেন্সেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে মেরিয়েটা কোরসিনিকে বিয়ে করেন। তাঁর বাবা বার্নাডো ডি নিকোলো মেকিয়াভেলি ছিলেন আইনবিদ।

মেকিয়াভেলি ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং ল্যাটিন ভাষা-সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। বলা হয়ে থাকে তিনি গ্রিক ভাষা পড়েননি। যদিও সেসময় ফ্লোরেন্স ছিল ইউরোপের গ্রিকপণ্ডিতদের মিলনকেন্দ্র। ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে মেডেসি পরিবারকে হটিয়ে ফ্লোরেন্স স্বাধীন হয়েছিল। এই মেডেসি পরিবার প্রায় ষাট বছর ফ্লোরেন্স শাসন করে। মেকিয়াভেলি ফ্লোরেন্সের দ্বিতীয় বিচারকের অধীনে চাকরিতে যোগ দেন। তিনি ফ্লোরেন্সের দাপ্তরিক নথিপত্র পুনর্লিখনের কাজ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে প্রধান শাসকের সচিব নিয়োগ করা হয়। ষোড়শ শতকের প্রথম দশকে দেশের পক্ষে তিনি বহু কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ইতালির রোমে পোপের দায়িত্ব পালন। তিনি দেখেছেন সিজার বর্জিয়া এবং তাঁর পিতা পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডারের রাজ্য বিস্তার ও প্রশাসনের কঠিন নিষ্ঠুরতা। যারা মধ্য ইতালির অধিকাংশ ভূখণ্ড নিজেদের অধিকারে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্জিয়া রাজ্যবিস্তারে গির্জার ভূমিকার পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। দ্বাদশ লুইস এবং সেপনিস ফোর্টের দেয়া মৃত্যুদণ্ড মেকিয়াভেলিকে রাষ্ট্রশাসক সম্বন্ধে বিশেষ করে *দ্য প্রিন্স* গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। ১৫০০ থেকে ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্লেরেনটাইন সেনা অভিযানে মেকিয়াভেলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিয়োগকৃত সেনাবাহিনীর উপর আস্থা না রেখে দেশের জনগণকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস নিয়োগকৃত সেনবাহিনী দেশের স্বার্থকে যতটা না গুরুত্ব দেয়, তার চেয়ে বেশি দেয় চাকরিকে। এতে তিনি স্বার্থকতাও অর্জন করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে নাগরিক সেনারা পিসাকে পরাজিত করে। অবশ্য মেকিয়াভেলির এই পদ্ধতি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে মেডেসি পোপ দ্বিতীয়

জুলিয়াসের সহায়তায় স্প্যানিস বাহিনী নিয়ে প্রাটোতে ফ্লোরেনটিনেস দখল করে নেন। এই অভিজ্ঞতা মেকিয়াভেলিকে দেশের সেনাব্যবস্থা সম্বন্ধে লিখতে সহায়তা করে। এরপর ফ্লোরেনটিয়ান নগররাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। মেডেসি ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে মেকিয়াভেলিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করেন। পরের বছর মেডেসি মেকিয়াভেলির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তার পরিবারকে ধ্বংসের অভিযোগ আনেন এবং তাঁকে বন্দি করেন। কারাগারে তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং তিন সপ্তাহ পর মুক্তি পান। এরপর রাজ্যের সকল কাজ থেকে অব্যহতি নিয়ে মেকিয়াভেলি জ্ঞানচর্চা এবং রাষ্ট্রীয় দর্শন ও রাষ্ট্রপ্রশাসন নিয়ে গ্রন্থ রচনায় মন দেন। ক্রমে তিনি দার্শনিক চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। রাজ্যশাসনব্যবস্থায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু নাটক রচনা করে ফ্লোরেন্সের বিদ্যোৎসাহী মহলে তিনি স্থায়ী আসন করে নেন। এগুলো ঠিক রাজনৈতিক নাটক না-হলেও রাজনীতিসম্পৃক্ত বলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তারপরও রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনাই মূখ্য বিষয় হয়ে উঠে।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে মেকিয়াভেলির মৃত্যু হলে ফ্লোরেন্সের সান্তাক্রোজে তাকে সমাহিত করা হয়। এবং সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। মেকিয়াভেলির রাজনৈতিক ইতিহাসভিত্তিক রচনার সংখ্যা এগারোটি। এর মধ্যে *দ্য প্রিন্স* অন্যতম। *দ্য প্রিন্স* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মেকিয়াভেলির মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে মেকিয়াভেলির রচনাসমূহ নিষিদ্ধ গ্রন্থতালিকাভুক্ত হয়। এর আশি বছর পর *দ্য প্রিন্স* এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে। অনুবাদ ও প্রকাশ করেন এডওয়ার্ড ড্যাররেস। এরপর ক্রমে *দ্য প্রিন্স* বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। হতে থাকে অনুবাদের পর অনুবাদ। অনূদিত হয় নানা ভাষায়। হয়ে উঠে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয় নতুন রাজ্যশাসনতন্ত্র, মেকিয়াভেলিবাদ। সৃষ্টি হয়েছে নতুন শব্দ 'মেকিয়াভেলিয়ান' (Machiavellian)। শব্দটির বাংলা অর্থ করা হয়েছে রাজনীতিতে ন্যায় অন্যায় বিচারশূন্য কৌশলী ধূর্ত; ফ্লোরেন্সের রাষ্ট্রনীতিবিদ ম্যাকিয়াভেলির অনুকম্পাকারী। (Samsad English-Bengali Dictionary, 2007 p.653) আর অক্সফোর্ড এডভান্স ডিকশনারি অর্থ করেছে এভাবে :

> Machiavellian (adj) using clever plans to achieve what you want, without people realizing what you are doing SYN CUNNING UNSCRUPULOUS.
>
> From the name of Niccolo Machiavelli, an Italian

politician (1469-1527), who explained in his book *The Prince*, that it was often necessary for rulers to use immoral methods in order to achieve power and success. (Seventh Edition 2000 p. 922)

দ্য প্রিন্স থেকে সৃষ্ট মেকিয়াভেলিয়ান শব্দটির এই আভিধানিক অর্থের মধ্যেই এর অন্তর্নিহিত ভাববৈশিষ্ট উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। *দ্য প্রিন্স* এর চারটি ইংরেজি অনুবাদ আমাদের হাতে এসেছে। অনুবাদকরা হলেন—জর্জ বুল (পেঙ্গুইন, ১৯৬১) পিটার বনডানেলা ও মার্ক মুসা যৌথ (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৮৪), ডবি-উ কে. ম্যরিয়ট (নেট থেকে পাওয়া) এবং সি ই ডেটমল্ড (রূপা: ২০০৩)। বর্তমান বাংলা অনুবাদে শেষের অর্থ্যাৎ সি ই ডেটমল্ড-কেই অনুসরণ করা হয়েছে। কেবল আক্ষরিক অনুবাদ নয়, বিষয়টিকে যথাসাধ্য বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে সরলিকরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যা পাঠককে আকর্ষণ করতে পারে সহজেই। অনুবাদের বাড়তি সংযোজন এর টীকাভাষ্য। গ্রন্থে উল্লেখিত ব্যক্তিবিশেষের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জুড়ে দেয়া হয়েছে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের আগ্রহের দিকে লক্ষ রেখে।

দ্য প্রিন্স-এর একাধিক বাংলা অনুবাদ প্রচলিত থাকার পরও গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগ নেয়ায় মুক্তচিন্তার স্বত্বাধিকারী শিহাব বাহাদুর যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তাঁকে ধন্যবাদের বেড়াজালে বাঁধা যায় না। গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছেন তরুণ শিল্পী মুস্তাফিজ কারিগর। তাঁকে ধন্যবাদ।

বিনীত

বদিউর রহমান
ঢাকা, ২০ আগস্ট, ২০১৫

বিষয় সূচি

রাজ্য শাসনব্যবস্থা কত প্রকার এবং কীভাবে তা অর্জন করা যায় ১৩
বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ১৪
মিশ্র শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে ১৫
আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর অধিকৃত ভারিয়াসে তাঁর উত্তরাধীকারদের বিরুদ্ধে কেন বিদ্রোহ দেখা দেয়নি ২৩
বিজয়ী রাজ্যের অনুরূপ বিজিত রাজ্য শাসন পদ্ধতি ২৬
শাসকের ক্ষমতা এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত বিজিত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ২৮
সৌভাগ্যবসত এবং অন্যের সাহায্যে অর্জিত রাজ্য প্রসঙ্গে ৩১
অসৎ পথে যারা ক্ষমতা দখল করে ৩৮
সাধারণতন্ত্র ৪২
কীভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্ণয় করা যায় ৪৬
ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রসঙ্গে ৪৮
নানা ধরনের সেনাবাহিনী এবং ভাড়াটে সেনা ৫১
সাহায্যকারী, মিশ্র এবং জাতীয় বাহিনী প্রসঙ্গ ৫৬
প্রতিরক্ষা বিষয়ে শাসকের কর্তব্য ৬০
যে সকল কারণে মানুষ বিশেষ করে শাসক প্রশংসিত কিংবা নিন্দিত হন ৬৩
বদান্যতা এবং মিত্যব্যয়িতা প্রসঙ্গে ৬৫
নিষ্ঠুরতা এবং ক্ষমাশীলতা এবং ভীতির চেয়ে ভালোবাসা কি উত্তম ৬৮
শাসক কীভাবে আস্থাভাজন হবেন ৭১
শাসক অবশ্যই অবজ্ঞা এবং ঘৃণা এড়িয়ে চলবেন ৭৪
শাসকদের তৈরি নগরদুর্গ ও অন্যান্য জিনিস কি প্রয়োজনীয় না ক্ষতিকর ৮৩
শাসক কীভাবে সুনাম অর্জন করবেন ৮৭
শাসকের মন্ত্রী প্রসঙ্গে ৯১
চাটুকারদের কীভাবে এড়িয়ে চলতে হবে ৯৩
ইতালির শাসকরা কীভাবে তাঁদের রাজ্য হারালেন ৯৫
মানুষের জীবনে ভাগ্যের প্রভাব এবং প্রতিকারের উপায় ৯৭
বিদেশী বর্বরদের হাত থেকে ইতালিকে মুক্ত করার পরামর্শ ১০০
টীকাভাষ্য ১০৫
নির্ঘণ্ট ১২৩

পিয়্যারো ডি মেডেসির পুত্র
মান্যবর লরেঞ্জোর প্রতি

নিকোলো মেকিয়াভেলি

রাজপুরুষের সহানুভূতি লাভের প্রত্যাশায় উপঢৌকন পাঠানোর রীতি দীর্ঘকালের।

সেই উপঢৌকন হতে পারে সহানুভূতি প্রার্থীর বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ কোনো সম্পদ কিংবা রাজপুরুষের পছন্দের কোনোকিছু। ফলে রাজপুরুষের বিশাল ধনসম্পদের সঙ্গে প্রতিদিন যুক্ত হতে থাকে ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, স্বর্ণখচিত পোশাক, কারুমণ্ডিত রত্ন আর মহামূল্যবান অলঙ্কারাদি।

আপনাকে দেবার মতো আমার তেমন কিছুই নেই। নেই কোনো ধনসম্পদ বা ঐশ্বর্য। আছে কেবল বর্তমান এবং অতীত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবান কিছু ধন; সে আমার জ্ঞান।

তাই নিবেদন করছি আপনার সমীপে।

জানি, এ আপনাকে দেবার মতো উপযুক্ত নয়; তবুও এ আমার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল। সেই ফসল লিপিবদ্ধ করেছি ক্ষুদ্রপরিসরের মলাটে।

তা-ই দিলাম আপনাকে।

উৎসর্গ করলাম আপনার মহানুভবতার কাছে।

আমি জানি আপনার কাছে এ তেমন গ্রহণযোগ্য কিছু নয়। তারপরও আমার বিশ্বাস আপনি মহান এবং উদার, তাই একে গ্রহণ করবেন। নিশ্চয়ই আপনি বিবেচনা করবেন, এতো অল্প সময়ে এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়।

তবে একে বিশিষ্টতাহীন অন্য কোনো গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না।

প্রতিপাদ্য বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আমি অন্যদের মতো ভাষাকে দুর্বোধ্য উপমা সমৃদ্ধ এবং জটিল করে তুলিনি। অতিরিক্ত বিশ্লেষণ কিংবা আপ্তবাক্য ব্যবহার করে অহেতুক গুরুগম্ভীর করতে চাইনি। এ গ্রন্থের জন্য আমি বাড়তি কোনো সম্মান বা প্রশংসা আশা করি না। কেবল বিষয়বস্তুর নতুনত্ব এবং গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে যদি কেউ গ্রহণ করেন, সম্মান দেখান—সেটাই আমার জন্য বড় প্রাপ্তি।

একজন শিল্পী নিচে দাঁড়িয়ে পাহাড়-উপত্যকা বা নৈসর্গিক দৃশ্য আঁকতে পারেন না। সেখানে শিল্পীকে পাহাড় কিংবা সমতলভূমি থেকে কিছুটা উঁচুতে উঠতে হয়। রাষ্ট্রনায়কদের বিষয়টাও সেরকম। সঠিকভাবে রাজ্য শাসন করতে হলে রাষ্ট্রনায়কদের নেমে আসতে হবে জনগণ কিংবা তাদের প্রতিনিধিদের কাছাকাছি। বুঝতে হবে জনগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

রাজপুরুষকেও বুঝতে দিতে হবে জনগণকে।

আপনার মহানুভবতা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে আমার এ ক্ষুদ্র উপহার। গ্রহণ করবে আমার অনুভবের আর্তি। আশা করছি আপনি পড়ে দেখবেন, আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। আর আপনার মহানুভবতার চোখ যদি উচ্চতর শিখর থেকে নিচে দৃষ্টি হানে, আপনি জানবেন কীভাবে আমি আঘাত করেছি বড়কে আর অবিরাম ভর্ৎসনা করেছি ভাগ্য বা বরাতের।

পরিচ্ছেদ এক

রাজ্য শাসনব্যবস্থা কত প্রকার এবং কীভাবে তা অর্জন করা যায়

মানুষকে শাসন করার জন্য অতীত এবং বর্তমানে যত প্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং শাসনব্যবস্থা ছিল এবং আছে, তার উৎস মূলত দুটি। এক সাধারণতন্ত্র এবং দুই রাজতন্ত্র।

রাজতন্ত্র আবার দুই ধরনের; বংশানুক্রমিক কিংবা নতুন কোনো শাসকের উদ্ভব। প্রথমটি বংশপরম্পরায় দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করে। আর নতুন রাজতন্ত্র হতে পারে একেবারেই নতুন। যেমনটা হয়েছিল ফ্রানসেসকো ফারজারের মিলান রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অথবা হতে পারে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ভেতর থেকে ভিন্ন পথে কোনো উত্তরাধীকারের দাবিদার হয়ে। স্পেনের ন্যাপলস রাজ্য প্রতিষ্ঠায় যেমন ঘটেছিল।

এভাবে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কোনো রাজপুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, না-হয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে শাসিত হবে। এই স্বাধীনতা অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন অন্যের বাহুবল কিংবা দখলকারীর নিজের ক্ষমতা কিংবা কোনো সৌভাগ্যের চাবিকাঠি অথবা অসীম সাহস।

পরিচ্ছেদ দুই

বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র

এখানে আমি সাধারণতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলব না। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কেবল রাজতন্ত্র সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। আমার বলার বিষয়, কীভাবে রাজতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে এবং তা টিকে থাকবে বা স্থায়ী হবে। প্রথমেই আমি বলব নতুন প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের চেয়ে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করা সহজ। এক্ষেত্রে শাসক যদি যুগোপযোগী আইন প্রবর্তনে পূর্বধারাকে ভুলে না যায়; অর্থাৎ পূর্বপুরুষের আইনের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখে তাহলে তেমন কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটলে অদক্ষ শাসকরাও সহজভাবে শাসনকাজ চালিয়ে যেতে পারেন। এমনকি কোনো কারণে রাজ্য হারালেও এই অদক্ষ শাসকরাই সহজভাবে তা পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

উদাহরণ হিসেবে আমাদের ইতালির ইতিহাসে ডিউক অব ফেরারা ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসিয়াসদের এবং ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় পোপ জুলিয়াস-এর রাজ্য আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছিলেন দীর্ঘদিনের বংশানুক্রমিক শাসনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে। বংশানুক্রমিক শাসক যদি অযথা তাঁর প্রজাদের ক্ষুব্ধ-ক্ষীপ্ত না করে তোলেন তাহলে স্বাভাবিকভাবে জনগণের প্রিয়ভাজন হয়েই থাকেন। যদি কোনো অতিরিক্ত ত্রুটি বা চারিত্রিক দুর্বলতা ঘৃণার কারণ না-হয়, তাহলে তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ অটুট থাকে। এই শ্রদ্ধাবোধের কারণে মানুষ সহজে তার স্থানে নতুন কাউকে দেখতে চায় না। কারণ তারা জানে কোনো পরিবর্তন পরবর্তী পরিবর্তনের পথ দেখায় এবং নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে।

পরিচ্ছেদ তিন

মিশ্র শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে

সদ্য প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা স্থায়ীকরণ কঠিন কাজ। প্রথমত একেবারে নতুন না হয়ে যদি বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার অংশ বিশেষের মিশ্রণ হয়, যাকে মিশ্র শাসনব্যবস্থা বলা হয়; শুরুতেই এর পরিবর্তন আসে নানা সহজাত সমস্যা থেকে। যা সকল শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। স্বাভাবিকভাবে দেশের জনগণ তাদের নতুন শাসককে গ্রহণ করে। তাদের ধারণা নতুন শাসকই সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। এই বিশ্বাস থেকে তারা বিদায়ী শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আসলে এভাবে তারা ভুল পথেই পা বাড়ায়। অল্পদিনের মধ্যেই তারা বুঝতে পারে, তাদের অবস্থা ক্রমে খারাপই হচ্ছে। তারা বুঝতে পারে নতুন শাসক, যাঁকে তারা সমর্থন করেছিল, সে তাদের আশা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। বরং তাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে নতুন নতুন দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা।

যে জনগণ একসময় নতুন শাসকের পাশে ছিল, তারা ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকে। ফলে প্রয়োজনের সময় শাসক কাউকে তাঁর পক্ষে পান না। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও পারেন না। দেশে যত বড় এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাক না কেন, শত্রুর আক্রমণ মোকাবেলা এবং নতুন ভূখণ্ড জয় করতে জনসমর্থন অত্যন্ত জরুরি।

ঠিক এই কারণেই ফরাসি সম্রাট দ্বাদশ লুইস অতি সহজে মিলান শহর দখল করে নিলেও তা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি। লোডোভিকো স্ফোর্জা তাঁর নিজস্ব সৈন্যবাহিনী নিয়ে একবারেই মিলান দখল করে নেয়। যে জনগণ একসময় দ্বাদশ লুইসকে সাদরে গ্রহণ করেছিল, তারা দেখল নতুন শাসক তাদের আশা পূরণে ব্যর্থ, বরং নতুন শাসক তাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে নতুন সব বোঝা।

একথা সত্যি যে, এমন বিদ্রোহীরাষ্ট্র পুনরুদ্ধার করার পর তা দখলে রাখা সহজ নয়। কারণ ক্ষমতা দখলকারী রাষ্ট্রনায়ক তার অবস্থানকে ধরে রাখতে যে-কোনো ব্যবস্থা এবং কৌশল গ্রহণ করতে পিছ-পা হন না। এমন পরিস্থিতিতে বিদ্রোহীদের কঠোরভাবে দমন এবং দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে দিতে বাধ্য হন। নজরদারি সুদৃঢ় করেন রাজ্যের সব দুর্বল এবং সন্দেহভাজন এলাকায়। এভাবে লোডোভিকো স্ফোর্জা তাঁর দক্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে প্রথমবার ফরাসি সম্রাট

দ্বাদশ লুইকে মিলান ত্যাগে বাধ্য করেন। দেশের জনগণও এসময় তাকে সমর্থন দেয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার সারা পৃথিবীকে সঙ্গে নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে বলিয়ান হয়ে প্রতিপক্ষকে ইতালি থেকে তাড়াতে হয়েছিল। যার কারণ আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি। তবে এটা ঠিক যে ফ্রান্স দুবারই মিলান হারিয়েছে।

প্রথম পরাজয়ের সাধারণ কারণ আমি আগেই বলেছি; কিন্তু এটা ভাববার বিষয় যে, দ্বিতীয়বার মিলান শহর ফরাসিদের হাতছাড়া হবার কারণ কী? হতে পারে রাজা নিজে দখলকৃত এলাকায় নজরদারি দৃঢ় করেননি কিংবা অন্য কাউকেও এর দায়িত্ব দেননি। যা যে-কোনো দখলকারীর জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়; কিন্তু সম্রাট দ্বাদশ লুইস তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তাহলে আমি বলব, যে ভূখণ্ড কোনো রাজা দখল করে নেন এবং নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন তা অভিন্ন ভূখণ্ড অর্থাৎ এর জনগণের মধ্যে জাতিগত ঐক্য আছে কি-না এবং তারা একই ভাষায় কথা বলে কি-না, তা দেখা জরুরি। যদি উভয় ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে নতুন দখলকৃত রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। বিশেষকরে তারা যদি স্বাধীনচেতা না-হয়। দখলকৃত রাজ্যকে নিজ আয়ত্বে রাখতে হলে নতুন শাসককে কিছু খারাপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে নতুন শাসকের অন্যতম করণীয় হলো পুরনো শাসকদের দুর্বল করে ধ্বংস করে দেয়া।

দুই. জনগোষ্ঠীর আচরণ ও নিয়মকানুনে ঐক্য থাকলে অধিকৃত রাজ্যের জনগণ সহজেই নতুন শাসকের শাসন মেনে নেয়। এমন উদাহরণ পৃথিবীতে বহু আছে। বারগান্ডি, ব্রিটানি, গ্যাসকোনি এবং নরম্যান্ডির বাসিন্দারা একসময় শান্তিপূর্ণভাবে ফরাসি শাসনের অধীনে বসবাস করেছে। ভাষার দিক দিয়ে কিছুটা বৈসাদৃশ্য থাকলেও আচরণগত ঐক্যের কারণে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে সহজেই। সবদিক বিবেচনা করে বলা যায়, অধিকৃত রাজ্য দখলে রাখতে দুটো বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হয়। প্রথমত অধিকৃত রাজ্যের পূর্বতন শাসকদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে হবে, এবং দ্বিতীয়ত কোনো আইন পরিবর্তন করা যাবে না। আরোপ করা যাবে না নতুন কোনো কর। তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে দুই রাজ্য একীভূত হয়ে যাবে। আবার যদি এমন হয়, অধিকৃত রাজ্যের ভাষা, রীতি-নীতি, আইনকানুন আলাদা, তাহলে বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় নতুন রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার; কঠিন তো বটেই। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো এবং উপযুক্ত কাজ হলো শাসকের নতুন রাজ্যে যাওয়া এবং সেখানে স্থায়ীভাবে থাকা। এমনটা হলে শাসক সহজে অধিকৃত এলাকা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন এবং তা স্থায়ী হতে পারে। তুর্কীরা এমনই করেছিল গ্রিক বিজয়ের পর। গ্রিসের সকল আইনকানুন ঠিক রাখার

পরও নতুন রাজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত না, যদি রাজা নিজে সেখানে গিয়ে বসবাস না করতেন। অকুস্থলে উপস্থিত থাকলে যে-কোনো সমস্যা দ্রুত জানা যায় এবং তার প্রতিকার করা যায়। আর যদি সেখানে না থাকে তাহলে সামান্য থেকে সমস্যা এত বড় হয় যে, সহজে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এছাড়া বিজয়ী দলের কর্মচারীরা বিজিতের ধনসম্পদ লুট করতে পারে না। প্রজারাও তাদের অভিযোগের কথা সহজেই জানাতে পারে শাসকের কাছে। ফলে সহজেই শাসকের স্নেহ পেতে পারে এবং অচিরেই নির্ভয়ে তারা নতুন শাসকের অনুগত হয়ে পড়ে। শাসক সেখানে থাকার কারণে কেউ কোনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ করতে সাহস করে না, ক্ষমতাচ্যুত করা তো দূরের কথা।

অধিকৃত এলাকা সুনিয়ন্ত্রণে রাখার এই কৌশলগুলো হলো প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকতা। গোটা অঞ্চলে কয়েকটি 'কলোনি' বা উপনিবেশ স্থাপন করে সেখানে যোগ্য শাসক নিয়োগ দেয়া। যা হয়ে উঠবে সারা দেশের কেন্দ্রস্থল। এটা করা না-হলে গোটা দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে নিয়োগ করতে হবে বিপুল সংখ্যক সেনা। 'কলোনি' বা উপনিবেশ তেমন ব্যয়বহুল কিছু নয়। অতি সামান্য খরচ এবং অনায়াসে 'কলোনি' পরিচালনা করা যায়।

এই 'কলোনি' গড়ে তুলতে যে জমি বা ঘরবাড়ি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়; তা খুবই সামান্য। জমি অধিগ্রহণের ফলে যে স্বল্পসংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা বড় কোনো আন্দোলন বা বিদ্রোহ গড়ে তুলতে পারে না। কারণ বেশির ভাগ মানুষই থাকে কোনো ক্ষতির বাইরে। ফলে তারা শান্ত থাকে। আর পূর্ববর্তী শাসকদের অবস্থা দেখেও তারা মাথা তুলতে সাহস পায় না। তাহলে এভাবেই বিষয়টির ইতি টানা যায়। এই ধরনের উপনিবেশ বা কলোনিতে তেমন বাড়তি খরচ লাগে না; এরা শাসকের অনুগত থাকে এবং সাধারণ জনসমষ্টির কাছে এরা ক্ষতির কারণ হয় না। আগেই বলা হয়েছে বিজিত রাজ্যের জনগণ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হওয়ায় তাদের কাছ থেকে ভয়ের কিছু থাকে না। এখানে আমাদের বক্তব্য সাধারণ মানুষকে প্রশংসায়, ভালোবাসায় কাছে টেনে নেয়া, না-হয় তাদের শেষ করে দেয়া। আঘাত করলে প্রতি আঘাত স্বাভাবিক। তাই প্রতিপক্ষকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করাই একমাত্র কাজ। যাতে আর কখনো তাদের ব্যাপারে ভাবতে না-হয়।

এধরনের উপনিবেশ বা 'কলোনি'র পরিবর্তে দখলকৃত এলাকা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে হলে তা হবে বিপুল অর্থব্যায়ের ব্যাপার। এমনো হতে পারে ঐ অঞ্চলের আয়ের সমস্ত অর্থই ব্যয় হয়ে যাবে সেনাবাহিনীর পেছনে। ফলে এই বিজয় লোকসানের কারণ হতে পারে। উপরন্তু এলাকার সকল মানুষ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। যারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে তারা

ক্রমে শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। এই শত্রুরা একসময় শাসককে আঘাত করতে পারে। আবার এমন করে মার খেয়েও তারা তাদের ঘরেই থাকবে। সবদিক বিবেচনা করে এমন সামরিক অভিযান অবশ্যই ক্ষতিকর এবং দুর্বিসহ; পক্ষান্তরে 'কলোনি' বা উপনিবেশ সৃষ্টি অনেক সহজ ও কার্যকর।

এছাড়া কোনো শাসক যদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চান তাহলে নিজেকেই রাষ্ট্রের প্রধান হতে হবে। হতে পারে দখলকৃত রাজ্য তার নিজের রাজ্য থেকে ভিন্ন; তাহলেও সেইসব অঞ্চল এবং তার আশপাশের ছোটো রাজ্যগুলোর উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রতিপক্ষের মধ্যে শক্তিশালীকে দুর্বল করতে হবে; এবং লক্ষ্য রাখতে হবে তার চেয়ে শক্তিশালী কেউ যেনো তার রাজ্যে প্রবেশ না করে। আরো লক্ষ্য রাখতে হবে দেশে যাতে কোনো রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি না-হয়। সত্যিকার অর্থে এভাবে এটোনিয়ানস বা রোমানদের গ্রিসে আহ্বান করেছিল। আর যেসব দেশে রোমানরা প্রবেশ করেছিল তা নিঃসন্দেহে জনগণের ডাকে।

যেভাবে এমনটি ঘটে সাধারণত যখন কোনো শক্তিশালি বিদেশী শাসক রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন কম ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ তাকে সাদরে গ্রহণ করে। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই সে সকলের সহযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। এভাবে নতুন ছোটো শাসকদেরও দখলকৃত রাজ্যের জনগণের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তেমন বেগ পেতে হয় না। সে খুব কমই দেখতে পায় যে, তাঁরা তেমন অধিকার অর্জন করতে বা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। তিনি তা পারবেন নিজের ক্ষমতা এবং অন্যের সহযোগিতা বলে। সহজেই কব্জা করতে পারবেন প্রকৃত শক্তিশালীকে। এভাবে ক্রমে সে রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে উঠবেন। আর যিনি এই সমস্ত বিষয়কে সঠিকভাবে ম্যানেজ করতে পারবেন না, তিনি দ্রুতই তার সমস্ত কিছু হারাবেন এবং নানা অরাজক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। নতুন দখলকৃত রাজ্যের ক্ষেত্রে রোমানরা বিষয়টি বেশ গুরুত্বসহকারে দেখেছেন। সেখানে তারা উপনিবেশ স্থাপন করে কোনো শক্তিশালি শাসককেই মাথা উঁচু করতে দেয়নি। কেউ শক্তিশালী হোক, কিংবা জনগণের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করুক এমন পরিস্থিতি তারা হতে দেয়নি। এ প্রসঙ্গে বেশি উদাহরণের প্রয়োজন নেই। কেবল গ্রিসের কয়েকটি প্রদেশের মধ্যেই উদাহরণ সীমাবদ্ধ রাখব। এচাইয়ানস্ এবং এটোলিয়ানস্ প্রদেশ দুটির প্রতি রোমানরা প্রথম থেকেই ছিল কঠোরমনোভাবাপন্ন। অন্যদিকে ম্যাসিডন রাজ্যের প্রতি রোমানরা বেশ নমনীয়তা দেখিয়েছেন এবং এন্টিওকাসের কাছ থেকে প্রদেশটি দখল করেও নিয়েছে। কিন্তু এচাইয়ানস্ এবং এটোনিয়ানস্-এর যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রোমানরা এর কোনোটিকে শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ দেয়নি।

ফিলিপ রোমানদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিলেও রোমানরা তাতে সাড়া দেয়নি। এন্টিওকাসের ক্ষমতাও তাকে কোনো রাজ্য পাবার ব্যাপারে সায় দেয়নি।

এই সব বিবেচনায় রোমানরা রাজ্য শাসনে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন তারা কেবল বর্তমান সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেননি, তারা ভেবেছেন ভবিষ্যৎ নিয়ে; প্রয়োগ করেছেন আধুনিক সব কৌশল। কোনো সমস্যা প্রকট হবার আগেই তা সমাধানের উদ্যেগ নিয়েছেন। ঠিক ডাক্তারদের মতো। ডাক্তাররা বলেন কোনো রোগের সূচনাতে চিকিৎসা যত সহজ, রোগ বেড়ে গেলে বা গেড়ে বসলে তা অত সহজ নয়। রোগ পুরানো হলে তাকে জানা যায় সহজে কিন্তু চিকিৎসা হয়ে পড়ে কঠিন। বিষয়টা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। দেশের ভেতরের দুষ্টশক্তি সাধারণত দেরিতে তাদের রূপ প্রকাশ করে। এতটা দেরিতে যে তাদের প্রতিহত করা কঠিন হয়ে পড়ে। শুরুতে তাদের চিহ্নিত করতে পারলে তাদের দমন করা যত সহজ, পরে তা তত সহজ থাকে না। দুষ্টদের বেড়ে ওঠার সুযোগ দিলে তারা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তখন তাদের দমন করা হয়ে ওঠে আরও কঠিন।

রোমানরা বেশ আগে থেকেই সমস্যাগুলো সনাক্ত করতে পেরেছেন এবং তা মোকাবেলাও করেছেন যথাসময়ে। কাউকে বেশি বেড়ে উঠতে দেননি। তাঁরা সব সময় যুদ্ধ এড়িয়ে চলেছেন। তাঁরা বুঝেছেন যুদ্ধ কোনো সমস্যার সমাধান নয়। বরং তা অন্যকে সুযোগ করে দেয়। এ কারণেই গ্রিসের ফিলিপ এবং এন্টিওকাস-এর বিরুদ্ধে আক্রমণে বিরত থেকেছে। তারা ভেবেছে প্রতিপক্ষও প্রতি-আক্রমণ করতে পারে। ফিলিপ কিংবা এন্টিওকাসের ওপর আক্রমণ করলে তারাও হয়তো ইতালি আক্রমণ করত। রোমান শাসকের দূরদর্শিতার জন্যই যুদ্ধ এড়িয়ে তারা নিজ জাতিকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। এসময় উভয় জাতিই যুদ্ধ এড়িয়ে নিজেদের রক্ষা করেছেন। আজকের দিনের বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে বলেন, 'সময়ের সুযোগের অপেক্ষায় থাকা'—এমন কথার গুরুত্ব না দিয়ে তাঁরা সময়ের আগেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁরা পথ চলেছেন তাদের বিচক্ষণতা এবং দৃঢ়তা নিয়ে। তাঁরা ভালোমন্দ নির্বিশেষে সকল দিকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। এবার ফরাসিদের দিকে ফিরে তাকানো যাক। দেখা যাক, আমরা যা বললাম বা আলোচনা করলাম, তার কতটা তাঁরা অনুধাবন করেছে। অষ্টম চার্লেস প্রসঙ্গে আমি বেশি কিছু বলছি না; আমি বলব দ্বাদশ লুইস প্রসঙ্গে। তাঁর অগ্রগতি আমরা সহজে বুঝতে পারব; কারণ তিনি দীর্ঘদিন ইতালি দখল করে রেখেছিলেন। নিজের কাছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি রাষ্ট্রকে দখলে রাখতে তিনি যে বিপরীতধর্মী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা-ও দেখা যেতে পারে।

ভেনেসীয়দের লক্ষ্য পূরণের উদেশ্যে রাজা দ্বাদশ লুইস ইতালি এসেছিলেন। ভেনেসীয়রা রাজাকে ইতালিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল লামবার্ডির একাংশ দখল করার উদ্দেশ্যে। এতে আমি রাজাকে দোষারোপ করব না। কারণ সেখানে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এমনকি ভবিষ্যতে রাষ্ট্র দখলের কোনো ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। কিন্তু তারপরও তাঁর চারদিকের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। রাজা অষ্টম চার্লেসের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণেই মূলত এমনটি ঘটেছে। রাজা দ্বাদশ লুইস চারদিকে বন্ধু খুঁজে বেড়িয়েছেন। চিন্তাভাবনা করে ঠাণ্ডা মাথায় তিনি এ-পথে এগিয়েছেন। এমন অবস্থায় চারদিকে সাফল্য অর্জন ছিল তাঁর জন্যে স্বাভাবিক। কিন্তু একটা ভুলের জন্য তাঁকে ব্যর্থতার দায়ভার বহন করতে হয়েছে। এই ব্যর্থতার দায় থেকে মুক্ত হবার জন্য, অথবা সুনাম পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে রাজা (দ্বাদশ লুইস) লামবার্ডি দখল করে নেন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য রাজা অষ্টম চার্লসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে হয়। অন্যদিকে জেনোয়া তাঁর অক্ষমতা স্বীকার করেন। বন্ধু হিসেবে পান ফ্লোরেনটিনেস, মারকুয়েজ অব মানটুয়া, দ্য ডিউক অব ফেরারা, দ্য লেডি অব ফোরলি, দ্য লর্ড অব ফায়েনজা, নেসারো, রিমিনি, কেমোরিনো, পিয়ামবিনো, দ্য লু কচেজ, দ্য পিসানেজ্ এবং দ্য সিয়েননেজ প্রমুখকে। এরা সবাই এগিয়ে এসে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন। ভেনেসীয়দের ভুলের প্রায়শ্চিত্য করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। লামবার্ডি দুটি শহরের বিনিময়ে তারা লুইসকে ইতালির দুই তৃতীয়াংশের প্রভু হিসেবে মেনে নেন।

এখন আমরা দেখব, রাজা (দ্বাদশ লুইস) কীভাবে ইতালিতে এতো সহজে আধিপাত্য বিস্তার এবং নিজেকে যোগ্য শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি কি তার বন্ধুদের সহায়তায় এ সার্থকতা অর্জন করেছিলেন? তাঁর বন্ধুর সংখ্যা ছিল অনেক তবে তাঁরা ছিলেন দুর্বলচিত্তের। সে কারণে নিজেদের রক্ষার স্বার্থে কেউ সাহায্য নিয়েছেন গির্জার, আবার কেউ ভেনেসীয়দের। ফলে সকল শক্তি ছিল তাঁর পিছনে। তাই সহজেই তিনি ইতালির বাকি শক্তির ওপর প্রভুত্ব করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু যখনই মিলান-এর ক্ষেত্রে ভিন্ন পথে চললেন রোম দখল করতে ষষ্ঠ আলেকজান্ডারকে সহযোগিতা করলেন, তখনই নিজের পতন ডেকে আনলেন। বুঝে উঠতে পারেননি এভাবে তিনি নিজেকেই দুর্বল করছেন। এসময় সহায়তাকারী বন্ধুরা সরে যেতে লাগলেন। বন্ধুদের হারিয়ে তিনি গির্জার শরণাপন্ন হলেন। গির্জা তার ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করল। এই নিষেধাজ্ঞা মানতে গিয়ে ক্ষমতাবৃদ্ধির পরিবর্তে বরং আরও হীনবল হয়ে পড়েন। শেষমেশ ষষ্ঠ আলেকজেন্ডারের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। টাসকোনি-র শাসক হতে তাঁকে বাধা দেয়া হয়। ফলে তিনি ইতালি চলে আসতে বাধ্য হন।

গির্জার কাছ থেকে প্রত্যাশিত ক্ষমতা লাভে ব্যর্থ হয়ে এবং পাশে থাকা শক্তিশালী বন্ধুদের হারিয়ে রাজা লুইস ন্যাপ্‌লস রাজ্যের দিকে নজর দেন। স্পেনের রাজার সঙ্গে ভাগ করে নেন ন্যাপ্‌লস।

ইতালির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি চুক্তি স্বাক্ষর করেন অন্যদের সঙ্গের এমন কি প্রতিপক্ষের সঙ্গেও। ন্যাপ্‌লস থেকে চলে যাবার সময় এমন একজনকে তিনি দায়িত্ব দিয়ে যেতে পারতেন, যিনি তার বশ্যতা স্বীকার করতেন এবং তাঁকে নিয়মিত কর দিতেন। কিন্তু তিনি নিলেন এমন একজনকে যিঁনি তাঁর চেয়ে শক্তিশালী এবং প্রয়োজনে তাকেই বিতাড়ন করতে পারে।

কিছু অধিকার বা জয় করার প্রবণতা মানুষের সহজাত। যখন তারা কৃতকার্য হন, তখন সবাই তাঁকে বাহবা দেয়, গলায় জয়ের মালা পরায়। এর মধ্যে সে এমন কিছু ভুল করে বসে যে, লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি থাকে। এমনকি সেই ব্যক্তি বা শাসক নির্বোধ হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী সময় ফ্রান্সের রাজা যদি শক্তিবৃদ্ধি করে নাপ্‌লস দখল করে নিতেন, তাহলে কোনোভাবেই তাকে দোষারোপ করা যেত না। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তা করলে স্পেনের রাজার সঙ্গে স্পেন ভাগ করে নিতে হতো না। এমন না করে তিনি যদি লামবার্ডিকে ভেনেসীয়দের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন, তাহলেও তাকে ক্ষমাযোগ্য বিবেচনা করা যেত। কারণ এর মাধ্যমে ইতালিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসতে পারত। তেমনি স্প্যানিয়ার্ড-এর সঙ্গে ন্যাপ্‌লস-এর বিষয়টি ধরে নেয়া যায়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একে ক্ষমাযোগ্য বিবেচনা করা যায় না।

রাজা লুইস পরবর্তীতে আরও পাঁচটি ভুল করেন; তিনি দুর্বলদের ধ্বংস করেন; ইতালিতে এক শক্তিধরকে আরও শক্তিশালী করে তোলেন; এক শক্তিশালীকে সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; তিনি নিজে সেখানে কোনো অধিকৃত এলাকায় যাননি কিংবা কোনো উপনিবেশও স্থাপন করেননি। এইসব ভুল তাঁর জীবদ্দশায় তেমন প্রভাব ফেলত না। কিন্তু তিনি করে বসলেন আর একটি ভুল; ষষ্ঠ ভুল। ভেনিসীয়ানদের বঞ্চিত করলেন তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে। লুইস যদি গির্জার ক্ষমতা বৃদ্ধি না করতেন, ইতালিতে যদি স্পেনিয়ার্ডনদের প্রতিষ্ঠা না করতেন, তাহলে তা যুক্তিযুক্ত হতো, গ্রহণীয় হতো। ভেনিসীয়ানদের দুর্বল করতে পারতেন। কিন্তু দুই দিকে পা দিতে গিয়ে তিনি মারাত্মক ভুল করে বসলেন।

অনেকে যুক্তি দেখাবেন, রাজা যুদ্ধ এড়াবার জন্য পোপের হাতে রোমানদের শাসনভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর একই কারণে রোয়েনের আর্চবিশপের ওপর দিয়েছিলেন ক্যারডিন্যালের ভার। কিন্তু এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আমি বলব তাঁরা

যে যুক্তি দেখাচ্ছেন তা একেবারেই দুর্বল। লামবার্ডি রাজা লুইসের হাত ছাড়া হয়ে গেলে এমন কোনো উদাহরণ রেখে যেতে পারেননি যা অন্যরা অনুসরণ করতে পারে; বিশেষ করে কোনো প্রদেশ দখলে রাখার ব্যাপারে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কারণ এ যুক্তিযুক্ত এবং স্বাভাবিক। পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডারের পুত্র ডিউক ভ্যালেনটিনো, যিনি সিজার বর্জিয়া নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন; তাঁর সিংহাসন আরোহণের সময় নানটেস-এ রোয়েনের আর্চবিশপের (কার্ডিনাল-দ্য এমবোয়েস) সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলাপ হয়েছিল। সে সময় কার্ডিনাল বলেছিলেন, ইতালিয়রা যুদ্ধের কৌশল বোঝে না। উত্তরে আমি বলেছিলাম, ফ্রান্স রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থাপনা বোঝে না। যদি তাঁরা বুঝতো তাহলে কিছুতে গির্জাকে এতো শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান হতে দিত না। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, গির্জার বিশালতা এবং সেভাবে ইতালিতে স্পেনকে ক্ষমতাবান করা নিজের ধ্বংস ডেকে আনল। এর মধ্যদিয়ে কিছু সাধারণ নিয়ম বেরিয়ে আসে, যা কখনই ব্যর্থ হয় না বা কদাচিৎ ব্যর্থ হয়। কোনো শাসক (প্রিন্স) এই নিয়মকে অস্বীকার করে শক্তিমত্তায় মত্ত হলে নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনবেন। নিজের ক্ষমতা কিংবা যোগ্যতাবলে অন্যকে ক্ষমতাবান করলে উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাসের দানা বাঁধতে পারে এবং সাহায্য-গ্রহিতা সাহায্যকারীর চেয়ে ক্ষমতাবান হয়েও উঠতে পারেন।

পরিচ্ছেদ চার

আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর অধিকৃত ভারিয়াসে তাঁর উত্তরাধীকারদের বিরুদ্ধে কেন বিদ্রোহ দেখা দেয়নি

অধিকৃত রাজ্য অধিকারে রাখার প্রতিকূলতা দেখতে গেলে অবাক হয়ে দেখতে হয় মহান আলেকজান্ডার কীভাবে অতি দ্রুত পুরো এশিয়া মহাদেশটা দখল করে নিলেন। দখলের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এমন কোনো পরিস্থিতি এখানে দেখা যায়নি। বরং তাঁর উত্তরাধীকাররা নির্বিঘ্নে শাসনকাজ পরিচালনা করে গেছেন। কোনো প্রতিকূলতাই তাদের সামনে আসেনি।

বিষয়টি পর্যালোচনা করে আমি বলতে পারি, অধিকৃত রাজ্য নিজ শাসনাধীন রাখার ক্ষেত্রে প্রচলিত দুটি নীতির একটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন— প্রথমত বিজয়ীকে পুরোপুরি শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, আর যারা থাকবে তারা থাকবে দাস হয়ে। অবশ্য এদের মধ্যে যারা শাসকের প্রিয়ভাজন তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদ দেয়া হবে। এরাই শাসনকাজে শাসককে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত বিজয়ী শাসক তাঁর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিজিত রাজ্য থেকে অভিজাত ব্যক্তিদের গ্রহণ করেন। এরা এমন হবেন যে, বংশানুক্রমে আভিজাত্যের কারণে আগে থেকেই তাঁদের থাকবে বিপুল সংখ্যাক অনুগত প্রজা, যাদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই শাসক থাকবেন সংবেদনশীল।

যে রাজ্যে কেবল একজন শাসক এবং বাকিরা থাকবে দাস সেখানে শাসক হবেন সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। রাজ্যে শাসকের চেয়ে কেউ ক্ষমতাবান থাকবে না। শাসক ছাড়া অন্য কাউকে মেনে চললেও তারা হবেন রাজ্যের মন্ত্রী কিংবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এই কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষ কোনো বদান্যতা থাকবে না। বর্তমান সময়ে আমাদের সামনে এই পৃথক ব্যবস্থার উদাহরণ তুরস্ক এবং ফ্রান্স। গোটা তুরস্কের শাসনকর্তা একজন; আর বাকিরা সব তার দাস। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য গোটা দেশকে তিনি কয়েকটি 'সানজাক' বা জেলায় ভাগ করে নেন। এর প্রতিটিতে তিনি শাসনকর্তা বা গভর্নর নিয়োগ করেন; যাঁদেরকে তিনি খুশিমতো পরিবর্তন করে থাকেন।

কিন্তু ফরাসি রাজা গুরুত্ব দিয়েছেন দেশের অভিজাত পরিবারের সদস্যের প্রতি।

প্রজারা তাদেরকে প্রভু বা শাসক বলেই জানত এবং মান্য করত এবং সেভাবেই শ্রদ্ধা করত। অবস্থা এবং অবস্থানের কারণেই এদের অবহেলা করে চলা রাজার পক্ষে সম্ভব নয়। অবজ্ঞা করলে তাদেরই বিপদ। উভয় দিক বিবেচনায় রেখে বলা যায়, তুরস্ক দখল করা খুবই কঠিন কাজ; কিন্তু একবার দখল হয়ে গেলে তাকে ধরে রাখা খুবই সহজ। তুরস্ক দখল করা কঠিন একারণে যে, এখানে দখলকারীকে আমন্ত্রণ জানানোর মতো কোনো অভিজাত গোষ্ঠী নেই। কোনো আক্রমণকারী এমন উদ্যোগ নিলেও এখানে প্রবেশ তাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ আগেই বলা হয়েছে রাজ্যের সকল দাস এবং নির্ভরশীল ব্যক্তিদের বিপদগামী করা খুবই কঠিন কাজ। যদি কেউ বিপদগামী হয়েও থাকে তাহলেও তারা বেশিদূর এগোতে পারবে না, কারণ তারা দেশের জনগণকে সঙ্গে পাবে না।

সুতরাং কেউ তুরস্ক আক্রমণ করতে চাইলে তাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হয়েই করতে হবে। কোনোরকম অন্তর্কলহের সুযোগ তারা নিতে পারবে না। একবার দখল করতে পারলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে হবে। বিতাড়ন করতে হবে গোটা বাহিনীকে, যাতে তারা পুনর্গঠিত হতে না পারে। এমন করতে পারলেই আক্রমণকারীকে বাঁধা দেবার আর কাউকে পাওয়া যাবে না; এবং বিজয় ছাড়া তাঁদের সামনে আর কিছুই থাকবে না। ভবিষ্যতেও তাঁদের কোনো ভয় বা আশঙ্কা থাকবে না।

অন্যদিকে ফ্রান্সের মতো শাসনব্যবস্থায় অভিজাত ব্যক্তিদের প্রলোভন দেখানো সহজ এবং এভাবে শত্রুশক্তি রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে সহজেই। কারণ এমন শাসনব্যবস্থায় অসন্তোষ লেগেই থাকে, ফলে পরিবর্তন চায়। যেভাবে বলা হলো এভাবেই এই ধরনের রাজ্য আক্রমণ এবং জয় করা সহজ। সহজভাবে রাজ্য দখল করা গেলেও তাকে টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। শাসনক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা গেলেও অভিজাতদের উপস্থিতিতে তাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে পড়ে। তাদের চাহিদা বেড়ে যায়। দখলকারি না পারেন তাদের চাহিদা পূরণ করতে, না পারেন তাদের ধ্বংস করতে। প্রজাসাধারণও পুরো সুখী হতে পারে না। তাঁরা রাজ্য হারাতে পারে সহজেই।

এবার আমরা যদি ডারিয়াস (পারস্য) রাজ্যশাসনব্যবস্থার দিকে চোখ ফেরাই, আমরা দেখব তা ছিল তুরস্ক শাসনের মতো। একারণেই মহান আলেকজান্ডারকে পুরো শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে হয়েছিল। আক্রমণ করল এবং দখল করে নিলো। উপরোক্ত কারণেই মহান আলেকজান্ডারের বিজয় সহজ এবং ডারিয়াসের মৃত্যুর পর তার শাসন নির্বিঘ্ন হয়েছিল। আলেকজান্ডারের উত্তরাধীকাররা ঐক্যবদ্ধ থাকলে তাঁর উত্তরসূরিরা নির্বিঘ্নে শাসন অব্যাহত রাখতে পারত, আত্মকলহ ছাড়া

অন্য কোনো ধরনের বিদ্রোহ এখানে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি।

ফরাসি দেশের মতো শাসনব্যবস্থায় রাজ্য দখল করা সহজ নয়। রোমানদের বিরুদ্ধে স্পেন, ফ্রান্স এবং গ্রিসে বারবার বিদ্রোহের মূল কারণ সেসব রাজ্যের কতিপয় দুর্বল শাসক। এদের মধ্যে যখন রোমানদের দুর্বল বিষয়টি অনিশ্চিত মনে হয় তখনই এরা বিদ্রোহ করতে সাহস পায়। কিন্তু যখন এসব শাসকদের স্মৃতি বিলীন হয়ে যায়, তখন রোমানরাই এসব দেশে তাদের শাসনব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে, হয়ে ওঠেন একচ্ছত্র অধিপতি। এমনকি এর পরেও যখন তারা অন্তর্কলহে লিপ্ত হন তখনো তাঁরা দেশের বিভিন্ন অংশ নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হন। দখল করার পর তাঁরা সব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যে শাসনব্যবস্থা চালু করেন ক্রমে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ দেশের জনগণ রোমান ছাড়া আর কোনো শাসনকর্তা মানতে নারাজ।

এইসব বিষয় পর্যালোচনা করে আমরা আলেকজান্ডারের এত সহজে এশিয়া দখলে রাখার বিষয়ে আশ্চর্য হই না। আশ্চর্য হই না অন্যদের ক্ষমতায় টিকে না থাকার বিষয়েও; যেমন ঘটেছিল পাইরডাস এবং অন্যান্যদের বেলায়। এক্ষেত্রে মহৎ কিংবা দুর্বল অধিকারীদের বেলায় কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। কারণ অধিকৃত রাজ্যের ধরনই ছিল আলাদা।

পরিচ্ছেদ পাঁচ

বিজয়ী রাজ্যের অনুরূপ বিজিত রাজ্য শাসন পদ্ধতি

বিজিত রাজ্যের আচার-ব্যবস্থা এবং আইনকানুনকে তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রথমত বিজিত রাজ্যের বিদ্যমান আইন ও আচার ব্যবস্থা সমূলে ধ্বংস করা। দ্বিতীয়ত বিজয়ী শাসককে সশরীরে বিজিত অঞ্চলে চলে যাওয়া এবং স্থায়ী বসবাস স্থাপন করা। এবং তৃতীয়ত বিজিত রাজ্যের আইনকানুন বলবত রেখে নির্ধারিত হারে কর প্রদানশর্তে কয়েকজন স্থানীয় শাসক নিয়োগ করা। যারা অবশ্যই বিজিত রাজ্যকে শাসকের বন্ধুভাবাপন্ন করে তুলবে।

নতুন শাসক (দখলকারী) এমন সরকার প্রতিষ্ঠা করলে তিনি জানবেন যে সরকার তাঁর সহযোগিতা এবং বন্ধুত্ব ছাড়া চলতে পারবে না। ফলে একে টিকিয়ে রাখা একটা জরুরি বিষয় হয়ে পড়ে। কোনো নগরী যেভাবে চলে আসছিল তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে, জনগণের ইচ্ছা অভীপ্সার দিকে শাসকের দৃষ্টি দিতে হয়। অধিকৃত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে রাখার নানা পদ্ধতি প্রয়োগের উদাহরণ হিসেবে স্পার্টান এবং রোমানদের বিষয়টি গ্রহণ করা যায়।

স্পার্টানরা এথেন্স এবং থেবেস দখল করে সেখানে সরকার গঠন করলেও দুটি রাজ্যই তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। রোমানরা কাপুয়া কার্থেজ এবং নুসানসিয়া দখল করে এদের ধ্বংস করে দেয়। ফলে কখনো তা হাতছাড়া হয়নি। গ্রিস দখল করার পর স্পার্টানদের মতো, স্বাধীনতা এবং তাদের নিজস্ব আইন মোতাবেক শাসনের সুযোগ দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে গ্রিস দখলে রাখার উদ্দেশ্যে ধ্বংস করতে হয়েছিল বেশ কিছু এলাকা (নগর)। আসলে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা ছাড়া কোনো রাজ্য দখলে রাখার আর কোনো নিরাপদ পথ নেই। যদি কেউ কোনো নগরের শাসনকর্তা হন, এবং স্বাধীনতা দানে উদ্যোগী হন, ধ্বংস না করেন, তাহলে নিজেরই ধ্বংস হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। কারণ তারা সবসময়ই তাঁদের নিজস্ব অতীত ঐতিহ্য এবং স্বাধীনতাকে ধারণ করেন। সময়ের ব্যবধান কিংবা নতুন শাসকের প্রলোভন কিছুই তাদের স্বীয় ঐতিহ্য থেকে দূরে সরাতে পারবে না এবং তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। সুযোগ খুঁজতে থাকবে বিদ্রোহের। তিনি (নতুন শাসক) যা-ই করুণ না কেন, যত সতর্কতা অবলম্বন করুন না কেন, তিনি যদি জনগণকে বিভক্ত না করেন, বিচ্ছিন্ন না করেন, প্রথমেই তারা তাদের স্বাধীনতার

নামে এবং অতীত ঐতিহ্যকে ধারণ করে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে যেমনটি ঘটেছিল পিসায়। ফ্লোরেনটানরা একশত বছরেরও বেশি সময় শাসন করার পরও জনগণ বিদ্রোহ করে।

কোনো শাসকের অধীনে থাকা রাষ্ট্রের জন্য এ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। যখন শাসকের শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, অথচ জনগণ সেই শাসনেই অভ্যস্ত, অন্যদিকে তাঁরা বিস্মৃত হয় তাদের অতীত ঐতিহ্য, তখন তাঁরা না পারে নিজেদের মধ্যে থেকে শাসক নির্বাচন করতে, না জানে কী করে স্বাধীন থাকা যায়। এভাবে তাঁরা সহজে অস্ত্র ধারন করতেও পারে না। ফলে নতুন শাসক খুব তাড়াতাড়ি তাদের কাছে টেনে নেন। এবং নিজেকে তাদের লোক বলে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে থাকে আর এক প্রাণশক্তি। থাকে ক্ষুব্ধ হবার প্রচণ্ড শক্তি এবং প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ় ইচ্ছা। নিজস্ব ইতিহাসের শিক্ষা তাদেরকে কিছুতে নিশ্চুপ বসে থাকতে দেয় না। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে হয় পুরোটা ধ্বংস করে দিতে হবে, না-হয় দখলকারীকে তাদের কাছে, তাদের মধ্যে এসে বসবাস করতে হবে। হয়ে উঠতে হবে তাদেরই একজন।

পরিচ্ছেদ ছয়

শাসকের ক্ষমতা এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত বিজিত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা

নতুন কোনো শাসকের নতুন শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যদি উৎকৃষ্ট উদাহরণমালার আশ্রয় নেয়া হয়, তাহলে কেউ যেন বিস্মিত না হন। মানুষ সব সময় পূর্ববর্তীদের পথে পথ চলতেই অভ্যস্ত। তারা সামনে এগিয়ে চলে অনুকরণের পথে। তারপরও তারা সবসময় সার্থকভাবে অন্যকে অনুকরণ করতে পারে না। পারে না যাদের অনুসরণ করে তাঁদের চেয়ে উন্নততর কিছু করতেও। সুতরাং কোনো সচেতন মানুষের জন্য কোনো মহৎব্যক্তির পথ অবলম্বন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়কে অনুসরণ করাই স্বাভাবিক। যদি তাঁর প্রজ্ঞা অন্যের সমপর্যায়ের নাও হয়, তাহলেও কোনো-না-কোনোভাবে তাঁর মহত্তের উৎকর্ষ বিকশিত হতে পারে। ঠিক যেন দক্ষ তীরন্দাজের মতো; তীরন্দাজ জানেন, তার লক্ষ্যস্থল বহুদূরে; আরও জানেন তার তীর ছোড়ার ধনুকের ক্ষমতা। তাই সে তাক করে একটু বেশি দূরে, এ কেবল অধিক উঁচুতে তীর ছোড়ার জন্য নয়, বরং এই উঁচুতে তাক করলে যথাস্থানে আঘাত করতে পারে।

তাহলে আমি বলব, নতুন শাসক—বিশেষ করে একেবারেই নতুন যারা, তাঁদের পথ চলতে হয় নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে। তাঁর সাহস এবং যোগ্যতাই তাঁকে অবস্থান নির্ধারণ করে দেবে। তবে সাধারণ নাগরিকের মধ্যথেকে শাসক হয়ে ওঠার পেছনে কাজ করে তাঁর অসাধারণ সাহস এবং অনন্য সৌভাগ্য। দেখা যায় এই দুটির কোনো একটির জোরে সে এগিয়ে যায় সকল বাধা অতিক্রম করে। কিন্তু যাঁরা ভাগ্যের ওপর কম নির্ভরশীল, তাঁরা সার্থক হবেই। বিষয়টি আরও সহজ হয় যখন এই শাসকের অন্য কোনো রাজ্য না থাকায় সে নতুন অধিকৃত রাষ্ট্রেই বসবাস করেন।

সৌভাগ্য নয়, বরং সাহস এবং যোগ্যতার বলে যারা শাসনক্ষতার অধিকারী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মোসেস, সাইরাস, রমুলাস এবং থেসিয়াস। আমরা মোসেস সম্বন্ধে তেমন আলোচনা করব না। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের আদেশ বাস্তবায়নের প্রতিনিধি। তাঁর সঙ্গে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ছিল সরাসরি যোগাযোগ এবং তা অর্জন করেছিলেন নিজের সৎগুণাবলির কারণেই।

সাইরাস এবং অন্যরা যাঁরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা দখল করেছেন, তাদের ব্যাপারে বলা যায় তাঁরা প্রশংসনীয় হয়েছেন তাঁদের যোগ্যতার বলে। তাঁদের নানা দিক বিশেষ করে আইনকানুন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তা মোসেসের থেকে তেমন ভিন্ন কিছু নয়, যদিও তাঁর একজন মহান শিক্ষক ছিলেন। তাদের জীবন ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাঁদের পেছনে কোনো সৌভাগ্যদেবী ছিলেন না; তাঁরা সুযোগকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এমন সুযোগ না পেলে তাদের দক্ষতা বিফলেই যেত, আবার তাঁদের অসাধারণ দক্ষতা না থাকলে যে-কোনো সুযোগ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারত।

মোসেস-এর যেমনটি হয়েছিল, তিনি দেখলেন ইসরাইলি জনগণ মিশরে বন্দি এবং মিশরিয়রা তাদের ওপর অত্যাচার করে, তাই প্রথমেই তিনি তাদের মুক্ত করে দিলেন; ইসরাইলিরা তাঁর পক্ষে চলে এলো। এটা জরুরি বিষয় যে, রমুলাস আলবা-কে ধরে রাখতে পারেননি; এবং নিজের জন্মপরিচয় প্রকাশ করলে তিনি রোমের প্রতিষ্ঠাতা এবং রাজা হন। ঠিক এভাবেই সাইরাস দেখলেন মোসেসের শাসনে পারশিয়ানদের অসন্তুষ্টি। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দীর্ঘ শান্তির পথে মোসেসদের নপুংশক ও দুর্বল করে ফেললেন। এথেনিয়ানরা ছত্রভঙ্গ না-হলে থেসিয়াস তাদের দখল করতে সাহসই পেতেন না। সুযোগ তাঁদের ভাগ্য খুলে দিয়েছিল। অসীম যোগ্যতা ও সামর্থ্যের কারণেই তাঁরা সুযোগকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। এভাবেই তাঁরা তাদের সুউচ্চ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এমন সুযোগ-যোগ্যতায় যারা শাসক হয়েছেন, রাজ্য জয়ের সময় তাঁদের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হলেও রাজ্য জয়ের পর তেমন অসুবিধা হয়নি। যেটুকু প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়েছে তা মূলত নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য, নতুন আইন-কানুন জারির কারণে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাজ্যে নতুন কোনো আইন প্রণয়ন এবং জারি না করলে কোনো শাসকই তেমন মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেন না। আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখা, অনেক নতুন শাসক পুরাতন বা প্রচলিত আইন মোতাবেক চলেই বেশি লাভবান হয়ে থাকেন। যাঁরা নতুন কিছু 'আইন' চালু করতে চান তাঁরা কখনো পুরোপুরি স্বস্তি পান না। তাই গতানুগতিকতার পথ বেছে নিতে হয় প্রতিপক্ষের ভয়ে, কারণ জনগণ স্বাভাবিকভাবে পুরোনো আইনেরই পক্ষে থাকে। আর অংশত থাকে গোঁড়া বিশ্বাসী, তারা নতুন কোনো কিছুকেই গ্রহণ করতে রাজী নয়। এ কারণে নতুন শাসকের প্রতিপক্ষ আক্রমণ করার সুযোগ পায়। প্রতিপক্ষ হিসেবে তাঁরা বেশ জোরেসোরেই আক্রমণ করে বসে। তখন অন্যরা খুব দুর্বলভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। সে কারণে এই প্রতিরোধকারীদের ওপর আস্থা রাখা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে।

বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হলে বুঝতে হবে নতুন আইন প্রয়োগকারী কি নিজের ওপর নির্ভরশীল, না অন্যের ওপর। অর্থাৎ বলতে হয় তারা কি তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিনীত অনুরোধ নিয়ে সামনে এগোবেন, না-কি শক্তি প্রয়োগ করবেন। নরমভাবে এগোতে গেলে খুব কম সাফল্যই তাঁরা অর্জন করতে পারবেন। আর যদি নিজের শক্তি দিয়ে এগোন তাহলে বিপদের সম্মুখীন হবার ভয় খুব কমই থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে সকল নবি বা মহাপুরুষ একহাতে অস্ত্র নিয়ে এগিয়েছেন, তাঁরা সার্থক হয়েছেন। আর যাঁরা তা করেননি তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। এই সব কারণের বাইরেও বলা যায়, মানুষের বিন্যাসব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। তাদেরকে যে-কোনো কিছুতে আকৃষ্ট করা সহজ, কিন্তু সেই বিশ্বাসে অটল রাখা কঠিন। সুতরাং নবিকে প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে কেউ বিপথগামী হলে, তাকে জোরপূর্বক বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনা যায়।

মোসেস, সাইরাস, থেসিয়াস কিংবা রমুলাস যদি নিজ শক্তিতে শক্তিশালী না হতেন, তাহলে তাদের প্রবর্তিত আইন-কানুন এত দীর্ঘদিন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারত না। ব্রাদার জিরোলামো স্যাভোনারোলা-র বেলায় এমনই ঘটেছিল। তিনি তাঁর নতুন আইন-কানুন প্রয়োগে ব্যর্থ হলেন। ব্যর্থ হলেন, যখন অনেকেই তাঁর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল। কারণ তাঁর এমন কোনো শক্তি ছিল না যে তাঁর আইন-রীতিকে স্থায়ী করতে কিংবা অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনতে পারে। তারপরও এই মহান ব্যক্তিরা নানা প্রতিকূলতার অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ। প্রতিপদে তাদের বিপদ যা তাদের সাহস এবং যোগ্যতার বলে জয় করতে পেরেছেন। একবার তাদের উপরে উঠতে দিলে সবাই তাদের শ্রদ্ধা করবে, আর তার প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করতে পারলে তারা ক্ষমতাবান, সুরক্ষিত, সম্মানিত ও আনন্দিত হবেন।

এমন বড় বড় উদাহরণের পর এবার একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব; যার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই, তবে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত দৃষ্টান্তকে জোরালো করবে। সে হলো সাইরাকাসের হিয়েরো। যিনি কোনো ভাগ্যের জোর ছাড়াই সাইরাকাসের শাসক হয়ে বসেন। সাইরাসবাসীরা তাদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তাকে নেতা মনোনীত করেছিল, সেই থেকে নিজের বুদ্ধিবলে তিনি সাইরাসের শাসক হয়ে ওঠেন। সাধারণ ব্যক্তিজীবনেও তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর জীবনী লেখকের মতে কোনো রাজ্যের অধিপতি হওয়ার মতো যোগ্যতা তাঁর ছিল। হিয়েরো পুরাতন সেনাবাহিনীকে ভেঙে দিয়ে নতুন সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। পুরাতন মৈত্রী ছেড়ে বেছে নেন নতুনদের। ফলে নিজের সৃষ্ট সেনাদের এবং মৈত্রী রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনো বাধা হয়ে ওঠে না। বলা যায় রাজ্য দখলে যত প্রতিকূলতা, রাজ্যশাসনে তা থাকে না বললেই চলে।

পরিচ্ছেদ সাত

সৌভাগ্যবসত এবং অন্যের সাহায্যে অর্জিত রাজ্য প্রসঙ্গে

একজন সাধারণ মানুষ যখন সৌভাগ্যবসত ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আসীন হন, তখন তাঁকে খুব সামান্য প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। মনে হয় যেন পাখায় ভর করে উড়ে চলেছেন। ক্ষমতায় আসীন হবার পর তাঁকে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়। এভাবে যাঁরা অর্থের বিনিময়ে কিংবা অন্যকোনো ক্ষমতাধর শাসকের সাহায্যে রাজ্যের অধিকারী হন, প্রতিকূলতা যেন তাঁর ওপর বাসা বেঁধে বসে। গ্রিসে এমন বহু উদাহরণ আছে। আয়োনিয়া এবং হেলেসন্ট নগরীতে দারিউস অনেককে শাসন ক্ষমতা দিয়েছিলেন তার নিরাপত্তা ও গৌরব রক্ষার স্বার্থে। এমন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেইসব শাসকদেরও, যারা সেনাবাহিনীকে কলুষিত করে সাধারণ সেনাকর্মকর্তা থেকে ক্ষমতায় বসেছেন। এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে যারা তাদের অভিবাসনের মাহাত্মদান করেন, তাদের ইচ্ছা এবং ভাগ্যের ওপর। এ দুটোই পুরোপুরি অনিশ্চিত এবং পরিবর্তনশীল। সাধারণত এধরনের শাসকদের সুশাসনব্যবস্থা পরিচালনার দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকে না। তাঁরা জানেন না (যদি তাঁরা সুদক্ষ এবং যোগ্য না হন, এটা জেনে নেয়া তাদের দায়িত্ব) কীভাবে নির্দেশ দিতে হয়, কারণ তারা ব্যক্তিগত পর্যায় ছাড়া কোনো কিছু আয়ত্বে নিতে পারেন না। তাঁরা পারেন না, কারণ তাদের এমন কোনো সেনাবাহিনী নেই যাদের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায়।

এছাড়া যে সকল রাষ্ট্র হঠাৎ গড়ে ওঠে, ঠিক যেমন প্রকৃতির অন্যান্য জিনিসের মতো অতিদ্রুত বেড়ে ওঠা, তাঁদের এমন কোনো শেকড় বা অবলম্বন থাকে না যে প্রথম প্রতিকূল ঝড়ের ধ্বংসযজ্ঞকে সামাল দিতে পারে। কথিত আছে, যাঁরা হঠাৎ রাজ্যের শাসক হয়ে বসেন, তাঁরা এমন যোগ্যতায় পুরস্কৃত হন যে, ভাগ্যচক্রে যা তাঁর কাছে এসে ধরা দিয়েছে, তা সহজেই ধরে রাখতে পারেন। এবং পরে তেমন ভিত্তি তৈরি হয় যা (শাসক হবার জন্য) অন্যরা করেছেন।

দক্ষতা এবং যোগ্যতা কিংবা কপালজোরে যাঁরা শাসক হয়েছেন তাঁর ব্যাখ্যায় আমাদের স্মরণকালের দুটি ঘটনা থেকে দুটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব। দৃষ্টান্ত দুটি হলো ফ্রানসেসকো স্ফোর্জা এবং সিজার বর্জিয়া। ফ্রানসেসকো মহৎ প্রাকৃতিক যোগ্যতার জোরে আইসঙ্গতভাবে সাধারণ নাগরিক থেকে মিলানের ডিউক পদে

আসীন হন। ক্ষমতায় যেতে হাজারো প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হলেও পরবর্তীকালে রাজ্য শাসনে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না বললেই চলে। অপর দিকে সিজার বর্জিয়া, যিনি ডিউক ভ্যালেনটিনো নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন, পিতার প্রভাবে রাজ্যশাসক হয়েছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে বেশিদিন তা ধরে রাখতে পারেননি। অবশ্য তিনি সাহস এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে সকল পথ অবলম্বন করেছেন রাজ্য শাসনের সূত্র খুঁজে বের করতে, যে রাজ্য তিনি পেয়েছিলেন শক্তি এবং ভাগ্যবলে। এই আলোচনায় আমরা দেখলাম যারা ক্ষমতায় এসে সবার আগে নিজের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় না করেন, নিজের যোগ্যতা এবং সাহসের বলে পরবর্তী সময়ও তা করতে পারেন। কিন্তু তা করতে হয় নানা ঝঞ্ঝাটের মোকাবেলা করে, যা রাজ্যের জন্য বিপদই ডেকে আনে।

আমরা যদি ডিউক ভ্যালেনটিনোর সমগ্র বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখব যে ভবিষ্যৎ ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করতে তাঁর যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। আমি বলি বিষয়টি আলোচিত হওয়া উচিত। ডিউক ভ্যালেনটিনোর উদাহরণ ছাড়া নতুন শাসককে পরামর্শ দেওয়ার মতো আমার আর কী আছে। তিনি যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন তা তাঁর চূড়ান্ত সার্থকতা অর্জনে কাজে লাগেনি। ত্রুটি ঠিক তাঁর নয়, এ তাঁর ভাগ্যের চরম অভিসম্পাতমূলক ব্যতিক্রমী বিপর্যয়। পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডারকে তাঁর ছেলেকে ধনেমানে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ডিউক ভ্যালেনটিনোর কাছ থেকে অনেক ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি দ্রুত এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে তা মোকাবেলা করেছেন। শুরুতে তিনি দেখলেন গির্জা ছাড়া তাঁকে কোনো রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন করা সম্ভব নয়। এ-ও জানতেন ডিউক অব মিলান কিংবা ভ্যানেটিয়ার কেউ এতে সম্মত হবেন না। ফায়েজা এবং রিমিনি ইতোমধ্যে ভ্যানেটিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। ইতালি সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে ভাবা যেত কিন্তু তা এমন লোকের অনুগতদের অধীনে, যারা পোপের ক্ষমতাকে ভয় পায়। এরা হলেন ওরসিনি এবং কালোন্না (দুই অভিজাত রোমান পরিবারের সদস্য)। তাই এদের ওপর নির্ভর করা যায় না।

রাজ্যে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রচলিত আইন-কানুনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে রাজ্যকে অকেজো করে দেয়া আলেকজান্ডারের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছিল। শাসক হিসেবে নিজেকে তাতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। ভিন্ন পথে ভ্যানেটিয়ানসদের পক্ষে পেলেন, ফরাসিরা ইতালিতে এলে তা তাঁর পক্ষেই যায়, তিনি যার বিরোধিতা করেননি। বরং ফরাসি রাজ দ্বাদশ লুইসের বিবাহের বিষয়টিও কাজে লাগালেন। লুইস ব্রিটানি মেরি এ্যান-কে বিয়ে করেছিলেন। ভ্যানেটিয়ানসদের সাহায্য এবং আলেকজান্ডারের সম্মতিতে রাজা ইতালিতে প্রবেশ করেন। তিনি মিলানে

পৌঁছামাত্র পোপ তার কাছ থেকে সৈন্যবাহিনী পেলেন রোমাগনা দখলের সহায়ক হিসেবে। রাজার সম্মতিতেই তিনি এই কাজ করেন।

রোমাগনা এবং কালোন্না দখলের পর ডিউক ভ্যালেনটিনো নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। তার দুটি ইচ্ছা ছিল, অধিকৃত রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং নতুন রাজ্য বিস্তার করা। কিন্তু দুইটি কারণে তা ব্যর্থ হয়ে গেল। এর একটি হলো নিজের সেনাবাহিনী সম্বন্ধে বিশ্বাসহীনতা আর দ্বিতীয়টি হলো ফরাসি রাজ্যের অনিচ্ছা। বলা যায় তিনি ওরসিনি সেনাবাহিনীকে ভয় করতেন। যে সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিনি রাজ্য জয় করেছেন, কঠিন সময়ে তারা তাঁকে ত্যাগ করতে পারে। নতুন রাজ্য জয়ে সমর্থন না করতে পারে এমনকি অধিকৃত রাজ্যও তারা দখল করে নিতে পারে। ফরাসি রাজের মনেও এমন ইচ্ছা থাকতে পারে। ওরসিনি সুগঠিত করতে ডিউক ফায়েনজা দখল করার পর বোলোগনা আক্রমণ করলেন এবং কি সাধারণভাবে হঠাৎ করে আক্রমণের পর আক্রমণ করে চললেন। ফরাসি রাজ্যের বেলায় তার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তিনি আরবিনোর ডুসি দখল করে টুসক্যানিতে অভিযান চালাতে চান। রাজা লুইস তাকে এই পরিকল্পনা বন্ধ করতে বাধ্য করেন, এরপর ডিউক সিদ্ধান্ত নিলেন ভাগ্য এবং অপরের সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করা যায় না। প্রথমেই রোমের ওরসিনি এবং কলোন্নাকে দুর্বল করে দিলেন। এই দুই রাজ্যের প্রায় সকল অভিজাত পরিবারকে নিজের করে নিলেন; বিনিময়ে তাঁকে বেশ অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে। শর্ত অনুযায়ী তাঁদের দিতে হয়েছে ভালো বেতন এবং উচ্চ সম্মান। দিতে হয়েছে নিয়োগ এবং আদেশ দানের ক্ষমতা। কয়েক মাস না যেতেই বিভিন্ন দলের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সকলে ডিউকের অনুসারী হয়ে যায়।

কলোন্নার সার্থকভাবে আধিপত্য বিস্তারের পর তিনি ওরসিনি ধ্বংসের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। কাজটা করতে তাকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। ওরিসিনির ক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে দেরি হলো যে ডিউক এবং গির্জার অতিরঞ্জনই তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। তিনি পেরুজিয়ান সাম্রাজ্যের ম্যাগিওনেতে একটি সভা আহবান করেন। সভায় আরবিনোতে বিদ্রোহ ঘটানো এবং রোমাগনায় অস্থিরতা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত হয়। যাতে ডিউক ভ্যালেনটিনো মহাবিপদের মুখে পড়েন। অবশ্য ফরাসি রাজের সহযোগিতায় তিনি এই সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। এভাবে নিজেকে সুনামের সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং ফ্রান্স বা অন্য কোনো বিদেশি শক্তির ওপর বিশ্বাস না করে প্রবঞ্চনার পথকে বন্ধ করে দেন, সুতরাং তাঁর রাজ্যশাসনে আর কোনো সঙ্কট রইল না। তিনি ভালোভাবেই জানতেন, কীভাবে নিজেকে গোপন করে ছদ্মবেশ ধারণ করে ওরসিনির সঙ্গে সম্পর্ক পূনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়।

তিনি তা করেছিলেন সিগনোর পাওলোর মাধ্যমে। পাওলোরকে ডিউক বশ করেছিলেন নানা কৌশলে এবং অর্থ, পোশাক, ঘোড়া ইত্যাদি উপঢৌকন পাঠিয়ে। তাদের সরল বিশ্বাসই সিনিগাগলিয়া তাদেরকে ডিউকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এইভাবে প্রভাবশালীদের নিশ্চিহ্ন করে তাদের অধস্তনদের বন্ধু হিসেবে টেনে কাছে নিলেন। ডিউক ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে যথেষ্ট দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। নিজে রোমাগনা এবং ডাচি-র আঁরবিনোর পুরো অধিকর্তা হয়ে বসলেন এবং এইসব রাজ্যের জনগণকে নিজের পক্ষে টেনে নিলেন। বিনিময়ে তাদেরকে দিলেন ধারণাতীত সম্পদ যা তাঁর অধীনেই তারা ভোগ করতে পারবে। ডিউকের এই অগ্রগতির ধারা অন্যের জন্য উদাহরণ হয়ে রইল। এ ব্যাপারে আমি আরও বিস্তারিত বলব।

রোমাগনা দখল করে ডিউক দেখলেন, অনেক ছোটো ছোটো খামখেয়ালি শাসকের অধীনে রোমাগনার জনগণ। তারা রাজ্য শাসনের চেয়ে লুঠতরাজেই বেশি আগ্রাহী। শান্তি এবং ঐক্যের পরিবর্তে এরা বিরোধ এবং বিশৃঙ্খলায়ই বেশি উৎসাহী। গোটা প্রদেশ দস্যুবৃত্তিতে নিমজ্জিত, ঝগড়াঝাঁটিতে ক্ষতবিক্ষত এবং এ-যেন সব রকম উগ্রতার পীঠস্থান। প্রথমেই তিনি দেখলেন এখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে নাগরিকদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এবং এর সার্বভৌমত্ব ফিরিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে শক্ত এবং ভালো সরকার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি কঠিন-কঠোর অথচ ধৈর্যশীল ডন র‍্যামিরো দ্য আরকো-র উপর সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে তাকে এই প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে আরকো রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। ফলে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হন। অল্প সময়ের মধ্যেই ডিউক উপলব্ধি করলেন, এমন শাসন বেশি দিন চালানো ঠিক নয়; বরং এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে বিচারালয় স্থাপন করলেন। সেখানে নিয়োগ করলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রধানকে; আর প্রতিটি প্রদেশে থাকবে তাদের নিজ নিজ আইনাবিদ। তিনি (ডিউক) দেখলেন র‍্যামিরো-র পূর্ববর্তী বিশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা জনগণের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে; তাই জনগণের মন জয় করার জন্য প্রচার করলেন, কোনো রকম অতিশাসন কিংবা নৃশংসতার জন্য তিনি দায়ী নন, বরং এ তার গভর্নরের কঠোর মনোভাবের প্রকাশ। একদিন সকালে তিনি র‍্যামিরোকে মেরে তার দেহ কেটে দু-টুকরা করে সেসেনার বাজারে রেখে দেবার আদেশ দিলেন। পাশেই ছিল একটা মুগুরী এবং একটা রক্তাক্ত খঞ্জর। এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে জনগণ কিছু দিন হতভম্ব ও বিস্মিত এবং সন্তুষ্ট থাকল।

যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, আবার সেখানেই ফিরে যাওয়া যাক। তাহলে আমি

বলব, ডিউক এখন নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করেন। ভাবেন আসন্ন বিপদ থেকে তিনি এখন নিরাপদ। তিনি নিজেই একটি সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছেন। তাঁর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন সকলকে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। এখন কেবল রাজ্য জয়ের পালা। নিজ দখলের বাইরে তাঁর ভয় একমাত্র ফরাসি রাজাকে নিয়ে। তিনি জানেন ফরাসির সাহায্য হিসেবের বাইরে। অবশ্য ডিউককে অতিরঞ্জিত করে দেখার বেশ পরে রাজা তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ডিউক নতুন সহযোগী খোঁজা শুরু করলেন। ফলে ফরাসির সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির কারণে স্পেনিয়ার্ড আক্রমণের উদ্দেশ্যে ন্যাপ্‌লস দখল করে নিলেন। এরপর গ্যায়েটা অধিকারে মন দিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে এমন অবস্থায় ফেলা যা তাঁর জন্য বিপদের কিছু না-হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি সহজেই সার্থক হতে পারতেন যদি পোপ আলেকজান্ডার বেঁচে থাকতেন।

বর্তমানকে সুরক্ষার জন্য এ ছিল ডিউক ভ্যালেনটিনোর গৃহীত কার্যক্রম। ভবিষ্যৎ রক্ষার চেতনাও তার মধ্যে কাজ করেছে। মূলত নতুন কোনো দখলকারি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে এমন কারো সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব রাখেননি। উপরন্তু আলেকজান্ডার তাঁকে যা দিয়েছেন তা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য তিনি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। এক. বিজয়ের পর বিজিতদের সপরিবারে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। যাতে নতুন পোপ তাদের সঙ্গে একাট্টা হয়ে আক্রমণ করতে না পারে। দুই. রোমের অভিজাত পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন যাতে পোপকে প্রতিহত করা যায়। তিন. কারডিনলস্ গোষ্ঠীকে নিজের দলে টেনে আনলেন এবং চার. আলেকজান্ডারের মৃত্যুর আগে যতদূর সম্ভব নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেন যাতে তার মৃত্যুর পর প্রথম আক্রমণ নিজেই সামাল দিতে পারেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর সময় এই চারটির তিনটিই তিনি বাস্তবায়ন করে ফেললেন। বিজিতদের নির্বিবাদে হত্যা করলেন, যত দূর তাঁর হাত যায়। কিন্তু খুব কম সংখ্যাক প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন। রোমের অভিজাতদের হাত করে নিলেন সহজেই, হাত করে নিলেন যাজকগোষ্ঠীর অধিকাংশকে। আরও অধিকারের উদ্দেশ্যে টাসকেনি দখল করে নিলে পেরুজিয়া এবং পিয়োমবিনো আপনা থেকেই বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। এর পর হাত বাড়ালেন পিসার দিকে। ফ্রান্সের দিক দিয়ে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকায় এবং স্প্যানিয়ার্ডরা ন্যাপ্‌লেস যুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়ায় উভয় পক্ষই তার বন্ধুত্ব কামনা করে। এই সুযোগে তিনি হঠাৎই পিসা দখল করে নেন। এরপর লুকা এবং সিয়েনা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এর দুটি কারণ, ফ্লোরেনটিনেসের প্রতি ঈর্ষা এবং ভীতি। এভাবে ডিউকের কাছে ফ্লোরেন্সও নিরাপদ নয় দেখে এবং সে যদি নগর দখল করে নেয়, যা করতে

পারতেন আলেকজান্ডারের মৃত্যুর বছর; তাহলে তাঁর ক্ষমতা এবং প্রভাব এতো বৃদ্ধি পেত যে, তিনি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন এবং নিজের শক্তি ও সাহসের ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারতেন।

ডিউকের মহাবীর ঘোষণার পাঁচ বছর পর আলেকজান্ডার মৃত্যুবরণ করেন। রোমাগনায় সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা ছাড়া আলেকজান্ডার তাঁর ছেলের জন্য আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি। তাঁর নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য রাজ্য ছিল অনিশ্চিত, এবং দুই প্রতিপক্ষ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে নিজে ছিলেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তারপরও বলতে হয় ডিউকের ধৈর্য এবং সাহসের কথা। তিনি যেভাবে মানুষকে জয় কিংবা ধ্বংস করতে পারঙ্গম ছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যেভাবে শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার ক্ষমতা রাখতেন তাতে তাঁর ঘাড়ের ওপর দুই প্রতিপক্ষ সেনাবাহিনী না থাকলে এবং তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ না-হলে যে-কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে তার যোগ্যতা বিচার করা যায় রোমাগনার বিশ্বস্ত থাকার মধ্য দিয়ে। তাঁরা এক মাসের বেশি সময় নিশ্চুপ অপেক্ষা করছিলেন। রোগশয্যায় আধমরা অবস্থায় রোম দখল করে নিলেন। তেমনি জয় করলেন ব্যাগলিওনি, ভিটেলি এবং ওরসিলি। এবার রোমে এলে কেনো প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। নিজের পছন্দমতো পোপ নির্বাচন করতে না পারায় অন্য কাউকে পোপ নির্বাচন বন্ধ করে রাখলেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর সময় ডিউক সুস্থ থাকায় সবই সুন্দরভাবে চলছিল। যেদিন দ্বিতীয় জুলিয়াস পোপ নির্বাচিত হন, সেদিন আমাকে বলেছিলেন, তাঁর বাবার (ষষ্ঠ আলেকজান্ডার) মৃত্যুর পর কি ধরনের প্রতিকূলতা সৃষ্টি হতে পারে এবং কীভাবে তা প্রতিরোধ করা যায়, সেসম্বন্ধে তিনি পুরোপুরি সজাগ আছেন। কিন্তু তিনি কখনোই ভাবতে পারেননি যে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারও মৃত্যুর ঘন্টা বেজে গেছে।

ডিউকের শাসনব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে বলা যায়, কোনো ব্যাপারে তাঁকে দোষারোপ করা যায় না। বরং বলতে হয় যারা ভাগ্য এবং অন্যের শক্তি বলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন ডিউক তাদের কাছে এক সার্থক দৃষ্টান্ত (যা আমি আগেই বলেছি)। তিনি যে সাহস এবং উচ্চাভিলাষের পরিচয় দিয়েছেন, সেই পরিস্থিতিতে এছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একমাত্র বাধা তাঁর পিতার অকাল মৃত্যু এবং নিজের অসুস্থতা।

একজন শাসক নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলে প্রথমেই নিজেকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার উপায় বের করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে প্রকৃত বন্ধু। শক্তি কিংবা চতুরতা, যেভাবেই হোক রাজ্য দখল করে প্রজাদের মনে ভয় সৃষ্টি করতে হবে, না-

হয় তাদের ভালোবাসা আদায় করতে হবে। এরপর শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। ধ্বংস করতে হবে সকল সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে। পুরাতন আইনের পরিবর্তে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। হতে হবে কঠোর এবং সেই সঙ্গে ক্ষমাশীল, মহানুভব এবং সদাশয়। ধ্বংস করতে হবে সন্দেহভাজন সেনাবাহিনীকে। গড়ে তুলতে হবে নতুন বাহিনী। রাজা এবং শাসকদের সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে বন্ধুত্ব, যাদের কাছ থেকে সহযোগিতা আশা করা যায় এবং তাকে আক্রমণ করতে সঙ্কোচ বোধ করে। আমি বলব একমাত্র ডিউক ভ্যালেনটিনো ছাড়া এমন সকল কাজের সার্থক কাজি এ সময়ে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল একটি কাজের ব্যাপারে তাকে দোষারোপ করা যায়, তা হলো দ্বিতীয় জুলিয়াসকে পোপ নির্বাচন করা। এ ছিল তাঁর ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ কথিত আছে যদিও তিনি তাঁর নিজের পছন্দ মতো পোপ নির্বাচন করতে পারলেন না, তাহলে তিনি বাধা দিতে পারতেন; কিন্তু কিছুতেই এমন কারোর প্রতি সম্মতি জানাতে পারেন না যাকে তিনি একসময় চটিয়েছিলেন। আর এমন একজন যাকে তিনি আগে থেকেই ভয় করতেন। এ কোনো নতুন কথা নয় যে, ভয় এবং ঘৃণা থেকেই শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

ডিউক যাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন তাদের মধ্যে আছেন কার্ডিনাল স্যান পিয়েট্রো আদ ভিনকোলা (পরবর্তী সময় দ্বিতীয় জুলিয়াস), কলোন্না, সান জিবজিও এবং অ্যাসকানিও। অন্য সবাই যারা পোপের কাছে এলেন তাঁরা তাঁকে ভয় করতেন। কেবল ডি-এ্যামবোইস এবং কিছু স্প্যানিস কর্ডিনাল ছাড়া। কার্ডিনালদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় জড়িত ছিল; আর ডি-এ্যামবোইস-এর ছিল প্রচুর শক্তি এবং ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব। ডিউক যে-কোনোভাবে স্প্যানিস কার্ডিয়ানদের মধ্য থেকে কাউকে পোপ নির্বাচন করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে তিনি কার্ডিলাস ডি-এ্যামবোইসকেই পোপ বানাতে পারতেন, তা-ও না-হলে ভিনকোলার কার্ডিনাল সান পিয়োট্রো নির্বাচন করতে পারতেন। যারা মনে করে যে বড় মানুষেরা সমূহ প্রাপ্তির লোভে পুরাতন ক্ষত ভুলে যায়, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারণা করেন। ডিউক তাহলে দ্বিতীয় জুলিয়াসকে পোপ নির্বাচন করে বড় ভুল করেছিলেন। যে ভুলের খেসারত দিতে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেলেন।

পরিচ্ছেদ আট

অসৎ পথে যারা ক্ষমতা দখল করে

সাধারণ নাগরিক থেকে রাষ্ট্রক্ষমতার শিখরে ওঠার দুটি উপায় আছে; যা ভাগ্য আরোপিত নয় কিংবা মসৃণও নয়। আমার মনে হয় বিষয়টি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা উচিত নয়। অবশ্য এর একটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনায় আসবে সাধারণতন্ত্র (রিপাবলিক) আলোচনা প্রসঙ্গে। এই দুটি পথ হলো ধূর্তামি, শঠতা এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অথবা দেশের কোনো সাধারণ নাগরিক এবং তার অনুসারীদের সাহায্যে। দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি প্রথমটির কথা বলব। এর একটি প্রাচীন; আর একটি সাম্প্রতিক। এর ঘটনাবলির ভিতরে প্রবেশ করার আগে আমার বিবেচনায় এর যে-কোনোটি অনুসরণ করাই যথেষ্ট।

সিসিলিয়াবাসী আগাথোক্লেস অতি সাধারণ এবং নিচু পরিবার থেকে উঠে এসে সাইরাকাসের রাজা হয়েছিলেন। তিনি ছিলের এক কুমারের (মৃৎশিল্পী) ছেলে এবং সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন নানা খারাপ ও দুষ্ট অভ্যাসের মধ্যে। ধূর্ততার সঙ্গে ছিল তার মানসিক ও শারীরিক শক্তি। ফলে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে তিনি সাধারণ সৈনিক থেকে সাইরাকাসের প্রাধান ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্তির পর তিনি দেশের প্রধান হবার পরিকল্পনা করেন। নিজের উগ্রতা এবং অন্যের প্রতি অসম্মানের কারণে জনগণ তাঁর ওপর বিশ্বাস হারায়। এ কারণে তিনি কারথাজিনি যান হ্যামিলকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার উদ্দেশ্যে। সে সময়ে তারা সিসিলিতে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এক সকালে তিনি সাইরাকাসের সেনেটর এবং প্রধান ব্যক্তিদের সভা আহ্বান করেন। বলা হয় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা। তিনি আগেই সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সভাস্থল ঘেরাও করে সিনেটর এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হত্যা করতে। এভাবেই তিনি কোনো বাঁধা ছাড়াই নগরীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন। এটা সত্যি যে পরপর দুইবার তাকে কার্থাজিয়ানদের হাতে পরাজিত হতে হয়েছিল। তবে শেষমেশ নগররাজ্যকে ঠিকই রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তিনি নগরকে নিয়ন্ত্রণে রেখেই শান্ত হননি। রাজ্য রক্ষা করতে কিছু সংখ্যক সৈন্য রেখে বাকিদের নিয়ে আফ্রিকা জয়ের উদ্দেশ্যে সাগর পাড়ি দেন। এভাবে অল্পকালের মধ্যে সাইরাকাস দখল করে নেন। ক্যার্থাজিনিয়ানদের পরাজিত করে বশ্যতা

শিকারে বাধ্য করেন। তাঁরা আফ্রিকা অগ্রযাত্রায় তাঁকে সহায়তা করেন এবং সিসিলিকে তাঁর হাতে ছেড়ে দেন।

আগাথোক্লেসের কর্মকাণ্ড ও নির্ভীকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ভাগ্যের ওপর তাকে খুব কমই নির্ভর করতে হয়েছে। আমি যেভাবে বলেছি অন্যের কোনো সাহায্য ছাড়াই তিনি ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উঠেছেন। তিনি ক্ষমতায় এসেছেন সেনাবাহিনীতে তাঁর উচ্চ পদের বদৌলতে; যা তিনি অর্জন করেছেন হাজারো প্রচেষ্টা এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। পরে অসীম সাহস এবং প্রয়োজনে হঠকারিতা দিয়ে তাঁর শাসন অক্ষুণ্ন রেখেছেন। সহকর্মীদের নিষ্ঠুরভাবে নিশ্চিহ্ন করা, বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং সৎ বিশ্বাস, দয়া এবং ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে কেউ সম্রাট হতে পারে ঠিকই কিন্তু যশ-গৌরবের অধিকারী হতে পারেন না। তা সত্ত্বেও আমরা যদি আগাথোক্লেসের প্রতিরোধ এবং বিজয় অর্জনের ক্ষমতা এবং তাঁর সমর্থনে অসীম সাহস প্রকাশ এবং দুষ্টদের নিয়ন্ত্রণের শক্তি বিবেচনা করি তাহলে তাঁকে কোনো মহৎ ক্যাপ্টেনের চেয়ে ছোটো করে দেখার কারণ নেই। এসব ছাড়া তাঁর সীমাহীন নৃশংসতা এবং অমানবিকতা, সেই সঙ্গে তার অসীম পাপাচার ইত্যাদি কারণে তাকে বিখ্যাত লোকদের শ্রেণিভুক্ত করা যায় না। আগাথোক্লেস-এর স্বার্থকতার পেছনে সাহস কিংবা ভাগ্য কোনোটিকে মেনে নিতে পারি না। বরং তা তিনি করেছেন এর একটি বা দুটো ছাড়াই।

এই আমাদের সময়, ষষ্ঠ আলেকজান্ডারের শাসন আমলে ওলিভেরোটো দ্য ফেরমো বাবা-মাকে হারিয়ে মামা জিয়োভ্যানি ফগলিয়ানির কাছে বড় হয়েছিলেন। যুবক বয়সেই তিনি পাওলো ভিটেলির অধীনে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। দক্ষতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিয়ে সুশৃঙ্খল সেনা হিসেবে তিনি সেনাবাহিনীতে উচ্চ আসনে আসীন হন। পাওলোর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর ভাই ভিটেলোজোর অধীনে কাজ করেন। স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক সামর্থ্য এবং নির্ভিকতার জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাহিনীর অন্যতম প্রধান হয়ে ওঠেন। কিন্তু এভাবে অপরের আদেশ পালন করাকে তিনি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারলেন না। তিনি ফার্মোর কিছু বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, যারা আগে থেকেই নিজেদের স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। ভিটেলোজোর সহায়তায় ফারমো দখল করে তার প্রধান হয়ে বসলেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মামা জিয়োভ্যানি ফগলিয়ানিকে লিখে পাঠালেন, বহুদিন দেশের বাইরে থাকলেন, এবার দেশে ফিরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান এবং নিজের দেশও একবার দেখতে চান। সেই সঙ্গে পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়টিও আছে। তা ছাড়া তিনি অনেক শ্রমের বিনিময়ে সম্মান অর্জন করেছেন। নিজের দেশের নাগরিকদের দেখাতে চান তাঁর আজীবনের শ্রম বিফলে

যায়নি। সুতরাং সে আসবে জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবং সঙ্গে থাকবে একশত বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা, যারা তাঁর বন্ধু। তিনি মামাকে অনুরোধ করলেন যাতে ফার্মোবাসীরা তাঁকে যথোপযুক্ত সংবর্ধনা দেয়। যা শুধু তাঁকে নয় জিয়োভ্যানিকেও সম্মানিত করবে। কারণ জিয়োভ্যানি তার নিকট আত্মীয় (মামা) এবং তিনি নিজেই তাকে (ভাগনেকে) বড় করেছেন। জিয়োভ্যানি ভারী খুশি হলেন এবং ভাগনের সংবর্ধনা আয়োজনে কোনো ত্রুটি করলেন না। ফার্মো শহরের নাগরিকদের নিয়ে আয়োজন করলেন নানা অনুষ্ঠানের। ফারমোর জনগণকে নিয়ে বরণ করে নিলেন ভাগনেকে। মামার প্রাসাদেই ব্যবস্থা হলো তাঁর থাকার। পরিকল্পনা সাজাতে ফার্মোতে কয়েকদিন কাটালেন ওলিভেরোটো। এরপর একদিন ওলিভেরোটো এক ভোজসভার আয়োজন করলেন, নিমন্ত্রণ করলেন ফার্মোর প্রধান নাগরিকদের আর মামা জিওভ্যানিকে। এমন ভোজসভায় সকল রীতিনীতির পর হলো নৈশভোজ। ভোজ শেষে ওলিভেরোটো ষষ্ঠ পোপ আলেকজান্ডারের এবং তার ছেলে সিজার বর্জিয়ার এবং নানা যুদ্ধজয়ের গুণকীর্তন করে মেকি আলোচনা শুরু করলেন। জিওভ্যানি এবং অন্যরা তার কথার উত্তর দিলে ওলিভেরোটো হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন এসব আলোচনা এভাবে খোলামেলা করা যায় না। বলেই তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন। জিওভ্যানি এবং অন্যরা তাকে অনুসরণ করল। সেখানে বসতে না বসতেই ওলিভেরোটোর গুপ্ত সৈন্যবাহিনী বেরিয়ে এসে আক্রমণ করল এবং জিওভ্যানি ও অন্য সকলকে হত্যা করল।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ওলিভেরোটো ঘোড়ায় চড়ে ফেরমো-র রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। চললেন নগর প্রধানের সুপ্রিম ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাসাদের দিকে। নগর প্রধানকে বাধ্য করলেন নতুন সরকার গঠনে এবং ওলিভেরোটো হলেন সেই সরকারের প্রধান। তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট যারা, যারা তাঁর বিরোধিতা করতে পারে তাদেরকেও মেরে ফেললেন। প্রশাসনিক ও সামরিক উভয় দিক দিয়ে তিনি তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তুললেন। ক্ষমতার শীর্ষে থাকার বছর না ঘুরতেই তিনি কেবল ফেরমোর প্রধানই নন আশপাশের শাসকদের কাছেও একজন ক্ষমতাবান শাসক হিসেবে পরিচিত হলেন। যদি সিজার বর্জিয়া তাকে প্রতারণা না করত তাহলে তাকে পরাভূত করা কঠিন কাজ ছিল। যতোটা আমি জেনেছি তিনি ওরসিনি এবং সিনিগাগলিয়ায় ভিটেলিকে ফাঁদে ফেললেন, ওলিভেরোটোকেও নেয়া হলো এবং শ্বাসরোধ করে মারা হলো। সেই সঙ্গে নির্ভীকতা ও দুর্বৃত্তায়নের গুরু ভিটেলোজোকেও হত্যা করা হলো। এসব ঘটনা ঘটে নিজের মামা জিওভ্যানি ফগলিয়ানি হত্যার এক বছরের মধ্যে।

অনেকের কাছে এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আগাথোক্লেস এবং তাঁর মতো আরো

অনেকে সীমাহীন রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং নৃশংসতা দেখিয়েও দীর্ঘ সময় নির্ভিঘ্নে রাজ্য শাসন করেছেন, যে রাজ্য তিনি গায়ের জোরে দখল করেছেন। এমনকি এরা নিজেদেরকে সার্থকতার সঙ্গে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছে নিজ দেশের জনগণের কোনো রকম বিরুদ্ধাচারণ বা ষড়যন্ত্র ছাড়াই। অন্যদিকে অনেকে নৃশংসতা দ্বারা কোনো রাজ্য দখলে রাখতে পারেনি এমনকি শান্তির সময়ও। সন্দেহজনক যুদ্ধের সময় তা ছিল আরও কঠিন। আমার বিশ্বাস, এর কারণ নৃশংসতার যথাযথ কিংবা দুর্বল প্রয়োগ। নৃশংসতা বা অত্যাচারের যথাযথ ব্যবহার বলতে আমরা বুঝি (প্রয়োজনে একে আমরা ভালো বলব, যদিও এ নিজেই খারাপ) যখন আত্মরক্ষার জন্য শাসককে নিষ্ঠুর হতে হয় এবং ক্রমে তা জনগণের মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত হয়। অত্যাচার বা নিষ্ঠুরতার দুর্বল ব্যবহার হলে প্রাথমিক পর্যায়ে অত্যাচারের মাত্রা কম হলেও সময়ের সঙ্গে তা বাড়তে থাকে। প্রথম পদ্ধতি ব্যবহারকারী ঈশ্বর এবং মানুষের সহায়তায় দেশকে সেবা দিতে পারেন, যেমন হয়েছিল আগাথোক্লেসের বেলায়। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বনকারী নিজের রাজ্য বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেন না। অন্যভাবে দেখা যায় যে, নতুন দখল করা রাজ্যের অধিকার রক্ষার স্বার্থে প্রথমেই কঠোর হতে হবে দখলকারীকে। ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে এক ধাক্কায়, যাতে প্রতিবছর তা নবায়ন করা না লাগে। এভাবে বার বার আঘাত না করলে বিষয়টি একসময় সহনশীল হয়ে ওঠে। কিন্তু যারা অন্যভাবে করেন, হয় ভীরুতার কারণে কিংবা অন্যের দুষ্ট পরামর্শে তাঁকে সবসময় তরবারি হাতে রাখতে হয়। এঁরা কখনো অধীনস্তদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন না। প্রকারান্তরে অধীনস্তরাও তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না। তাঁরা অনবরত নতুন নতুন ভুল করেই চলেন। আঘাত শুরু করতে হবে কমমাত্রায়, যাতে সবাই পৃথকভাবে কমই অনুভব করবে। অন্যদিকে এর সুফল ফলবে একইসময় কাউকে খেতাব প্রদান করলে। এভাবে তাকে প্রশংসাই করবে। সাধারণভাবে সবার ওপরে একজন শাসক এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যে, ভালো কিংবা মন্দ কোনোভাবেই প্রজাসাধারণের প্রতি আচরণে কোনো তারতম্য না-হয়। কিন্তু যখন কারোর খারাপ দিন আসে তখন পদক্ষেপ নিতেই হবে। তখন আর তাঁর পক্ষে খারাপ কিছু করবার সময় থাকবে না। কারণ মনে করা হবে এ বাধ্য হয়ে করা হয়েছে, ফলে তা কোনো শুভফল বয়ে আনবে না।

পরিচ্ছেদ নয়

সাধারণতন্ত্র

এবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই। কোনো রকম বলপ্রয়োগ কিংবা অত্যাচার ছাড়াই দেশের জনগণের সমর্থন নিয়ে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তাকে সাধারণতন্ত্র বলা যায়। একে অর্জন করতে হলে কোনো মহৎ গুণ কিংবা অসাধারণ সৌভাগ্যের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন কেবল সদানন্দ শক্তির ব্যবহার। আমি বলব এধরনের শাসনব্যবস্থা অর্জিত হতে পারে দুই ভাবে; সাধারণ মানুষের কিংবা সমাজপতিদের সাহায্য সমর্থনে। এমন রাষ্ট্রে দুই প্রকার অসামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রথমত সমাজপতিদের শাসন শোষণ যা সাধারণ মানুষ অপছন্দ করে; অন্যদিকে তাঁরা (সমাজপতিরা) মানুষকে শাসন শোষণ করতেই বেশি আগ্রহী। সচেতনতার এই বৈচিত্র্য এবং ভাবনা রাষ্ট্রের তিন কার্যক্রমের একটির জন্ম দেয়। এগুলো হলো কোনো কঠোর শাসক বা নৃপতি অথবা ঢিলেঢালা সরকার কিংবা অতিস্বাধীনতা। জনগণের কিংবা সমাজপতিদের ইচ্ছায় একজন শাসকের সৃষ্টি হয়, এর যে-কোনো একটির সমর্থন থাকলেই এই সুযোগ আসতে পারে। সমাজপতিরা যখন দেখেন যে তাঁরা জনগণকে বাধা দিতে পারছেন না, তখন তাঁদের গোত্রের বা শ্রেণির কারো প্রভাব প্রতিপত্তিকে সমর্থন দিয়ে সামনে এগিয়ে নেন, এবং তাঁকে শাসক বানান। তাঁকে সামনে রেখে এবং তাঁর অধীনে থেকেই নিজেদের ইচ্ছাপূরণে সমর্থ হন। সাধারণ জনগণও যখন দেখে সমাজপতিদের প্রতিহত করতে পারছে না, তখন তাদের মধ্য থেকে কারও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সম্বল করে সামনে এগোতে থাকে এবং তাঁকে শাসক বানায়। ফলে তাঁদের শাসকের ক্ষমতাবলে অন্যরা নিশ্চিত হতে পারে। জনগণ থেকে উঠে আসা শাসকের চেয়ে অভিজাত শ্রেণির শাসকের পক্ষে রাষ্ট্র চালানো বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। অভিজাত শ্রেণির শাসকদের চারপাশে সবসময় তাঁর সমান মতামত প্রকাশকারী মানুষরা ঘিরে থাকে। যে কারণে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা কিংবা পক্ষে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সাধারণ জনগণের সমর্থন নিয়ে যিনি শাসক হন, তিনি একাই থাকেন। তাঁর চারপাশে অন্যকেউ থাকে না। থাকলেও তার সংখ্যা খুবই সামান্য এবং যারা থাকে তারা তাকে মান্য করে, সম্মান করে। এছাড়া অভিজাত শ্রেণির লোকদের নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়েও তাদের সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করা সহজ। তাদের আকাঙ্ক্ষা অভিজাতদের

চেয়ে কখনো বেশি হতে পারে না। এরা নির্যাতিত হতে অভ্যস্ত কিন্তু অভিজাতরা তা কখনো মেনে নেবে না। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, জনগণ নির্বাচিত শাসক কখনো তার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্নদের শান্ত করতে পারে না; অন্যদিকে অভিজাত শাসকরা খুব সহজেই তাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারে।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো, জনগণ যদি শাসকের বন্ধু না-হয় তাহলে তারা তাঁকে পরিত্যাগ করবে। কিন্তু কোনো অভিজাত শাসকের মনে ভয় থাকে, তাঁর অবন্ধুরা কেবল তাঁকে ত্যাগই করবে না বরং তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তাঁরা অতিরিক্ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিচক্ষণ হওয়ায় আগেভাগেই নিজেদের সুরক্ষিত করে তোলে, এবং যারা সার্থক হবে বলে আশা করে তাদের সহায়তা নিশ্চিত করে। শাসক এইসব গণমানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে দায়বদ্ধ; কিন্তু তিনি অভিজাতদের সঙ্গে সেভাবে নাও করতে পারেন। আবার নিজের ইচ্ছা মতো যেকোনো সময় তাঁদেরকে (অভিজাত শ্রেণি) কাছে টেনে নিতে পারেন কিংবা পারেন দূরে সরিয়ে দিতে। তাদের দিতে পারেন অনেক কিছু আবার বঞ্চিত করতে পারেন সবকিছু থেকে। বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে আমরা বলব অভিজাত শ্রেণি আবার দুই ধরনের। বলা যায়, হয় তারা সম্পূর্ণভাবে শাসকভাগ্যের সঙ্গে জড়িত এবং নির্ভরশীল; অথবা এর বিপরীত। এভাবে যারা আপনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তারা যদি লোভী হয় তাদেরকে সুনজরে দেখবেন এবং সম্মান করবেন। যারা তাদেরকে আপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত না রাখবে তাদেরকে দুইভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি তাঁরা দুর্বলচিত্ততা এবং সাহসের অভাবে দূরে সরে থাকে, তাহলে আপনি তাদের ব্যবহার করতে পারেন। তাদের যদি সাধারণ বুদ্ধি থাকে তাহলে তারা আপনার সম্মান করবে। এদের ভয় করার কিছু নেই। কিন্তু তারা যদি কোনো উচ্চাভিলাষ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে আপনার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে তাহলে বুঝতে হবে তারা আপনার (শাসকের) স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। এধরনের মানুষ থেকে শাসকের দূরে থাকা উচিত; এবং তাদেরকে সরাসরি শত্রু ভাবা বাঞ্ছনীয়। যদি কখনো দুর্দিন আসে, তারা সেসময় বিপক্ষেই থাকবে এবং সম্পূর্ণ ধ্বংসের কাজে ব্যস্ত থাকবে।

যারা জনগণের সমর্থনে শাসক বা রাষ্ট্রনায়ক হন তাঁদের সবসময় নিজের সুনাম বজায় রেখে চলতে হয়। তাঁরা নির্যাতিত হবেন না, এর বাইরে তাঁদের আর কোনো প্রত্যাশা নেই। কিন্তু যারা জনগণের ইচ্ছার বাইরে অভিজাত শ্রেণি দ্বারা নির্বাচিত হন, তাঁদের অতি দ্রুত এবং সবার আগে জনগণের সমর্থন অর্জন করা জরুরি। এটা করা খুবই সহজ, জনগণকে কেবল নিজের ছত্রছায়ায় নিয়ে নিলেই তারা খুশি। একজন মানুষ হিসেবে তখন শাসকের দুর্ব্যবহারই তার আশঙ্কার কারণ, তখন যদি

সামান্য সহানুভূতি পায় তাতেই সে মহাখুশি। সহজেই তারা শাসকের পক্ষে চলে আসে এবং মনে করবে যেন তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। একজন শাসক নানা ভাবে জনগণের সমর্থন অর্জন করতে পারেন। যা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে নাও মিলতে পারে, আবার তা কোনো আইন দ্বারাও নির্ধারিত নয়। এই প্রসঙ্গের আমি ইতি টানতে চাই এই বলে যে, রাষ্ট্রশাসকের সব সময় প্রজাদের সমর্থন এবং ভালোবাসা লাভে সচেষ্ট হতে হবে; তা না-হলে বিপদের দিনে কারো সমর্থন পাওয়া যাবে না। স্পার্টার রাজা নাবিস সমগ্র গ্রিস এবং রোমান সেনাবাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করেছিলেন নিজের শক্তি সামর্থ্য দিয়েই; রক্ষা করেছিলেন তাঁর নিজের দেশকে। বিপদের সময় তাঁর পক্ষে যে সামান্য সমর্থক ছিল তাদের নিয়েই যুদ্ধ জয়ে সফল হন। দেশের জনগণ যদি তাঁর প্রতি বিমুখ হতো, তাহলে এ বড় কঠিন কাজ ছিল। আশা করি কেউ আমার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করবেন না, যদি একটি নিরস আপ্তবাক্য উচ্চারণ করি। আপ্তবাক্যটি হলো : যিনি জনগণের ওপর নির্ভর করেন, তিনি চোরাবালির উপর ঘর বাঁধেন।' একথা সত্য হতে পারে যখন কেউ ভাবেন যে তিনি শত্রু কিংবা প্রশাসক কর্তৃক নির্যাতিত হন। তখন জনগণই তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। এমন হলে তিনি প্রতারিতই হবেন; যেমন ঘটেছিল রোমে গ্রাচি এবং ফ্লোরেন্সে মেসের স্ক্যালির বেলায়। যাদের আদেশ করা যায়, তাদের ওপর আস্থা রেখে এবং বিপদে সাহসী এবং সংশয়হীন থাকলে এবং যথার্থ কাজে নিঃশঙ্ক থাকলে, সব কিছু সাহসিকতার সঙ্গে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে গেলে তিনি কখনোই জনগণ দ্বারা প্রতারিত হবেন না, যার ফলে তার রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে সুদৃঢ়।

যে শাসক পুরো বেসামরিক শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে নিতে চান তাঁদের ঝুঁকি অনেক বেশি। এমন শাসকরা নিজেই নির্দেশ দেন অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে আদেশ দেন। দ্বিতীয় ধারায় শাসনব্যবস্থা দুর্বল এবং নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। এই পদ্ধতিতে যার উপর ম্যাজিস্ট্রেসির দায়িত্ব অর্পিত হয়, শাসক তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। বিপদে এরা কখনই শাসকের পক্ষে থাকে না। এরা সরাসরি বিরোধিতা করে, অথবা অধিনতা মানতে অস্বীকার করে। কারণ বিপদ আসলে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শাসকের হাতে থাকে না।

---

*আপ্তবাক্যটি তিন অনুবাদের ভাষায়:

1. he who relies upon the people builds upon quicksand.—C.E.D etmond.
2. he who builds on the people, builds on mud.—George Bull and Peter Bondlanella.

যে সব নাগরিক ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে আদেশ শুনতে অভ্যস্ত তারাও বিপদের সময় শাসকের নিয়ন্ত্রণাদেশ মান্য করতে চায় না। এরকম সন্দেহভাজন সময়, বিশ্বাস করতে পারেন এমন মানুষ খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। এমন পরিস্থিতিতে শাসক স্বাভাবিক সময়ের মতো স্বস্তিবোধ করতে পারেন না, যেমন প্রজাসাধারণ প্রত্যাশা করে। অর্থাৎ সবই তাঁর আদেশে পরিচালিত হবে, সবাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে, সবাই তাঁর জন্য মৃত্যুর প্রতিশ্রুতি দেবে; যদিও তা সম্ভব নয়। কিছু দুঃসময়ে যখন সরকারের জন্য জনগণের সমর্থন অতি জরুরি হয়ে পড়ে তখন খুব সামান্য সংখ্যক মানুষই শাসকের পক্ষে থাকবে; এমন অভিজ্ঞতা খুবই বিপজ্জনক, যদিও তা একবারই ঘটে।

একজন যথার্থ শাসক তাহলে তিনি, যার কার্যক্রমের ফলে রাজ্যের সকল জনগণ ভাববে যে তাঁর ক্ষমতায় থাকা অপরিহার্য। ফলে তারা সবসময়ই তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে।

পরিচ্ছেদ দশ

কীভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্ণয় করা যায়

বিভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আর একটি বিষয় হলো কোন শাসক কীভাবে প্রয়োজনে নিজের ক্ষমতাবলে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। না কি সব সময় অন্যের শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়। এই বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে হলে আমি বলব, আমার বিবেচনায় যাঁরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারেন তাঁরা প্রচুর জনশক্তি ও অর্থের বিনিময়ে সুদক্ষ সেনাবাহিনী নিয়োজিত করবেন। তাঁকে আক্রমণ করলে যারা তাদেরকে (আক্রমণকারি) সম্মুখ সমরে প্রতিহত করতে পারেন। তবে আমি গুরুত্ব দেই তাদের যারা সরাসরি শত্রুর মোকাবিলা করতে পারেন না এবং সবসময় অন্যের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে হয়। এরা প্রয়োজনে আত্মগোপনের পথ বেছে নেন এবং সেখানেই থাকেন। প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে আমি কিছু বলেছি, প্রয়োজনে আবার বলব। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে বলা যায়, তাঁরা অবশ্য শাসনকর্ম পরিচালনাস্থান বা শহরকে কঠিন নিরাপত্তায় আবদ্ধ রাখবেন; এছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই। এই নিরাপত্তা রক্ষায় যা প্রয়োজন তা সবই করতে হবে। সেক্ষেত্রে গোটা দেশ সম্বন্ধে তেমন না ভাবলেও চলবে। শাসক যে নগরীতে বসবাস করেন, সেই নগরীকে ঘিরে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করলে এবং অন্যদিকে তিনি যদি নিজের পায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারেন তাহলে সহজে তাকে কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। সুরক্ষিত নগরীতে অবস্থানরত এবং দেশের অনুরক্ত প্রিয় জনগণ দ্বারা বেষ্টিত শাসককে কোনো প্রতিপক্ষ আক্রমণ করতে চায় না।

জার্মানির নগরগুলো পুরো স্বাধীনতা ভোগ করে। নগরপ্রাচীরের বাইরে তাঁদের সামান্যই জমিন থাকে। শাসককে মানা না মানা তাদের ব্যাপার। নিজেদের বা প্রতিবেশীর ক্ষমতায় তাদের কোনো ভীতি নেই। তাঁরা এত সুরক্ষিত যে, তাঁদের আক্রমণ করা আরও কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য আছে প্রয়োজনীয় দেয়াল এবং নালা বা পরিখা। তাঁরা অস্ত্রশস্ত্রে যেমন সুসজ্জিত থাকেন তেমনি তাঁদের হাতে থাকে অন্তত এক বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় এবং জ্বালানির সঞ্চয়। এছাড়া দেশের জনগণ যাতে কর্মহীন না হয়ে পড়ে সে জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করে রাখা হয়। এই কাঁচামাল অন্তত এক বছর কাজে লাগানো যায়। যা

দিয়ে কলকারখানা চালু রেখে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। এছাড়া তাঁরা সামরিক প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাদের নিয়মিত মহড়া চলে। একজন শাসক যিনি তার নগরকে সুরক্ষিত রাখেন এবং দেশের জনগণের কাছে আদৃত হন, এমন রাষ্ট্র শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমই থাকে। যদি কেউ কখনো আক্রমণ করেই বসে তাহলে সে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। বলা যায় পৃথিবীর সবকিছুই এত অনিশ্চিত যে-কোনো শাসক সারা বছর সেনাবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে অবরুদ্ধ করে রাখতে পারেন না; তা তিনি যত ক্ষমতাধরই হোন না কেনো।

কেউ হয়ত যুক্তি দেখাতে পারেন, নগরীর বাইরের জনগণ যখন দেখবে যে তাঁরা ক্রমশ শত্রুদের দ্বারা বিধ্বস্ত এবং ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখন তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। নিজেকে রক্ষা করার স্বার্থান্বেষী মনোভাবের কারণে শাসকের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে যেতে পারেন। আমি এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলতে চাই ক্ষমতাবান এবং সাহসী শাসকের জন্য এমন বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা কঠিন নয়। কারণ সে জানে, দুষ্ট বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। অথবা তাদেরকে শত্রুর নৃশংসতা সম্বন্ধে ভীতির সৃষ্টি করে, কিংবা যাদের অসন্তোষ অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে সচেতন ও কৌশলী হওয়া।

এছাড়া এটা ধরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত যে, শত্রুবাহিনী রাজ্য আক্রমণ করে প্রথমেই লুঠতরাজ এবং ধ্বংস চালাবে। তারপরও এর জনগণ সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত। ক্রমে শাসকের আশঙ্কা কমে যায়, কারণ জনগণের তেজী উত্তাপ কিছুটা প্রশমিত হয়। ধ্বংস যা হবার হয়ে গেছে এবং মন্দ যা তা প্রতিকারের পথ আর খোলা নেই, তাই জনগণ শাসকের পক্ষে দাঁড়াতে এগিয়ে আসবে। কারণ তারা তাঁকে মান্য করে এবং সম্মান করে। তাঁকে রক্ষা করতে তাদের বাড়িঘর পুড়ে গেছে, বিষয় সম্পত্তি লুঠ হয়ে গেছে। স্বাভাবিক নিয়মে উপকারীর উপকার স্বীকার করা এবং উপকারীকে উপকার করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

সকল দিক বিবেচনা করে বলা যায়, শত্রুর আক্রমণের সময় জনগণের নৈতিক মনোবল অটুট রাখা সম্ভব। অবশ্য তাদেরকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় রসদ যোগান দিতে হবে।

পরিচ্ছেদ এগারো

ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রসঙ্গে

এখন শুধু বাকি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে বলা। এই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্জনের যা কিছু সমস্যা তা আগেই ঘটে যায়। নিজ ক্ষমতা অথবা ভাগ্যচক্রে এই ধরনের রাষ্ট্র অর্জিত হতে পারে। কারণ তাঁরা প্রাচীন ধর্মীয় আইনের উপর নির্ভরশীল। সেই আইন এত শক্তিশালী এবং মানসম্পন্ন যে তা শাসককে তাঁর অবস্থানে সুদৃঢ় করে রাখে, তাতে তাঁদের আচরণ এবং ব্যক্তিজীবন যে রকমই হোক না কেনো। এই শাসকরা নিজেদের রক্ষা করা কিংবা শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় না করেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেন। তাদের রাষ্ট্র অরক্ষিত থাকলেও কেউ তা দখল করতে আসবে না। প্রজারা তাদের শাসন ব্যাপারে এতই নিরাসক্ত যে তারা ভাবতেই পারে না, শাসক তাদের থেকে ভিন্ন কিছু।

একমাত্র এই ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থাই নিরাপদ এবং আনন্দদায়ক। এই ধরনের রাষ্ট্র যেহেতু অসীম জ্ঞান অতিমানবীয় শক্তি দ্বারা পরিচালিত এবং তা মানুষের বোধবুদ্ধির উর্ধ্বে তাই এ সম্বন্ধে আমি আর আলোচনা করতে চাই না। অসীম ক্ষমতার ইঙ্গিতেই এমন শাসকের উত্থান এবং স্থিতি। সুকঠিন এবং নিঃর্শতভাবে মেনে নেওয়ার এই বিধানসমূহ মানুষের আলোচনার বাইরে।

তা সত্ত্বেও কেউ যদি প্রশ্ন করেন ষষ্ঠ আলেকজান্ডারের পূর্বে গির্জা ইতজাগতিক বিষয়ে যে ক্ষমতা এবং মহত্ব অর্জন করেছিল ইতালির ক্ষমতাসীনরা এবং মহৎ সামন্তশ্রেণি এমনকি ক্ষুদ্র ও খেতাবধারীরাও তাকে খুব কমই তোয়াক্কা করেছে; তাহলে ফরাসি নৃপতি কেন ভীত হলেন এবং ভিনিসবাসীকে পরাস্ত করেও ইতালি থেকে বিতাড়িত হলেন। এর কারণ সকলের জানা থাকলেও বিষয়টি নতুন করে আলোচনা করা অবান্তর হবে না।

ফরাসি রাজা অষ্টম চার্লস ইতালির ক্ষমতায় আসীন হবার আগে ইতালি ছিল পোপ ভেনেটিয়ান, ন্যাপলসের রাজা, মিলানের ডিউক এবং ফ্লোরেনটাইনদের শাসনাধীন। তাঁরা সবাই রাজ্য শাসনক্ষেত্রে দুইটি বিষয়ের ওপর বিশেষ নজর রাখতেন। প্রথমত কোনো বাইরের শক্তি যাতে ইতালিতে প্রবেশ করতে না পারে এবং দ্বিতীয়ত কেউ যেন উচ্চাভিলাষী এবং ক্ষমতা লোলুপ হয়ে না ওঠে।

এদের মধ্যে অন্য সকলের সজাগ দৃষ্টি ছিল পোপ এবং ভ্যানেটিয়ানদের প্রতি।

ভ্যানেটিয়ানদের প্রতিহত করতে প্রয়োজন অন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। ঠিক যেমনটি হয়েছিল ফেরারা রক্ষার সময়। পোপকে সামলাতে রোমের সামন্তপ্রভুদের ঐক্যবদ্ধ হতে হয়েছিল। পরে তারা ওরসিনি এবং কোলোন্না নামে দুই দলে বিভক্ত হয়েছিল। তারা প্রতিনিয়ত ঝগড়া করত; তাদের হাতে থাকত অস্ত্র। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পোপের ক্ষমতাকে দুর্বল এবং রুগ্ন করে ফেলেছিল।

এসব সত্ত্বেও কখনো কোনো পোপ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন; প্রতিহত করে এই দলকে। যেমন ঘটেছিল চতুর্থ সিক্সটাস-এর বেলায়। কিন্তু এই উৎপাত কখনোই কোনো স্থায়ী ফল ফলাতে পারেনি। এর মূল কারণ তাদের সংক্ষিপ্ত জীবন অর্থাৎ পোপ হিসেবে স্বল্পায়ুতা। একজন পোপের স্বাভাবিক ক্ষমতার গড় আয়ু দশ বছর। এই অল্প সময়ে কোনো দলকেই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কোনো পোপ যখন কোলোন্নাকে পরাজিত করতে সমর্থ হন তখন ওরসিনিদের প্রতি বিরূপ কেউ এসে কোলোন্নার পক্ষ নিয়ে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ওরসিনিদের দমন করা আর সম্ভব হয় না। এই কারণেই ইতালিতে ধর্মীয় শাসনকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হতো না।

এরপর শাসন ক্ষমতায় আসেন পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার। তিনি ছিলেন তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে ভিন্ন ধারার। তিনি দেখলেন গির্জার অর্থ এবং ক্ষমতা দিয়ে কতটা করা যায়। ফরাসিদের ইতালি আক্রমণকালে আলেকজান্ডার ভ্যালেনটিনো ডিউককে কাজে লাগিয়ে সব কাজ গুছিয়ে নিলেন। ডিউকের কার্যবিবরণীর সময় আমি তা উল্লেখ করেছি। আলেকজান্ডার গির্জার ধনসম্পদ বৃদ্ধির চেয়ে তার পুত্র ডিউকের ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে বেশি নজর দিলেও তাঁর কার্যক্রমে গির্জাও বেশ লাভবান হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরধীকার হিসেবে পুত্র ডিউক এই পরিশ্রমের ফল ভোগ করেন।

দ্বিতীয় জুলিয়াস ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে গির্জা সর্বোচ্চ শক্তিশালী এবং রোমাগনার সর্বময় মনিব হয়ে ওঠে। রোমান আভিজাত্য ভেঙ্গে পড়ে এবং আলেকজান্ডারের আক্রমণের সমস্ত উপাদান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তিনি অর্থ সঞ্চয়ের পথ খুঁজে পান, যা আলেকজান্ডারের আগে কখনই ছিল না। দ্বিতীয় জুলিয়াস কেবল আলেকজান্ডারের পথ অনুসরণই করেননি, বরং তিনি আরও এগিয়ে বোলোগনা দখল, ভেনেটিয়ানসদের নিশ্চিহ্নকরণ এবং ফরাসিদের ইতালি থেকে বিতাড়ন করার পরিকল্পনা করলেন এবং সব ক্ষেত্রেই সার্থক হলেন। তিনি আরো প্রশংসিত হলেন এ জন্যে যে, তিনি যা কিছু করেছেন গির্জার জন্যে, নিজের জন্যে নয়। এছাড়া তিনি ওরসিনি এবং কোলোন্না দ্বন্দ্বের রাশ টেনে তাদের পোপের শাসনের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও দুটি

বিষয় তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এক. গির্জার ক্ষমতা দেখিয়ে তাদের বাগে আনা; দুই. এদের কারো কেনো মৌলিকত্ব কিংবা এমন শক্তি ছিল না যা তাদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে। কারভিয়ানদের অংশগ্রহণ ছাড়া তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারে না। কারণ এরা রোমের মতো অন্য স্থানেও দলবাজি করে ব্যারণদের সাহায্য নিয়ে। এইভাবে পুরোহিত প্রধানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে ব্যারনদের মধ্যে মতভেদ এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মান্যবর দ্বাদশ পোপ লিও তাঁর সাধ্যমতো গির্জার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। আশা করা যায়, যদি তার পূর্ববর্তী কেউ শক্তিতে গির্জাকে মহৎ করে তুলে থাকেন, তা সত্ত্বেও তাঁর স্থান থাকবে সবার উপরে আর তা থাকবে তাঁর মহত্ব এবং অসীম গুণাবলির জন্য।

পরিচ্ছেদ বারো

নানা ধরনের সেনাবাহিনী এবং ভাড়াটে সেনা

ইতিপূর্বে আমি নানা ধরনের রাষ্ট্রের গুণবৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি এদের সার্থকতা এবং ব্যর্থতা নিয়েও। ব্যাখ্যা করেছি কীভাবে সবকিছু যথাযথভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। এবার আমরা দেখব নৃপতিশাসিত রাজ্যের রক্ষণ ব্যবস্থা এবং আক্রমণ পদ্ধতি কী রকম হতে পারে, যা যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম।

আমরা বলেছি একজন শাসকের মজবুত ভিত কত জরুরি—এবং তা না-হলে ধ্বংস অনিবার্য। সকল রাষ্ট্রের, তা নতুন পুরাতন বা মিশ্রিত যে রকমই হোক, তার ভিত্তি হবে কঠোর আইন-কানুন এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী। এবং যেহেতু শক্তিশালী সেনা ছাড়া যথার্থ আইনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, সেহেতু যথার্থ আইন সেখানেই কার্যকর হবে যেখানে ভালো সেনাবাহিনী আছে। আইনের বিষয় ছেড়ে এখন আমি সেনাবাহিনী নিয়েই কথা বলব। তাহলে আমি বলব যে সেনাবাহিনী দিয়ে শাসক তার প্রতিরক্ষা বুহ্য রচনা করবেন—হতে পারে তার নিজস্ব বাহিনী, কিংবা ভাড়াটে বাহিনী বা সাহায্যকারী কোনো দল অথবা এসবের মিশ্রণে গঠিত কোনো সেনাদল। ভাড়াটে এবং সহায়ক সেনাদল অপ্রয়োজনীয় এবং বিপজ্জনক। যদি ভাড়াটে সেনাদল দিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়, তা কখনো স্থিতিশীল এবং সুরক্ষিত হতে পারবে না। কারণ তারা বিভিন্নভাবে উচ্চাভিলাষী এবং আদৌ সুশৃঙ্খল নয়। বন্ধুদের কাছে এরা অবিশ্বাসী এবং দাম্ভিক; কিন্তু শত্রুর ভয়ে ভীষণ ভীতু। ঈশ্বরকে এরা ভয় পায় না এবং মানুষের প্রতিও তাদের কোনো আস্থা নেই। এদের ওপর নির্ভরশীল শাসককে এরা ধ্বংস করেই ছাড়বে, সুস্থ থাকবে কেবল আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। শান্তির সময় ভাড়াটে বাহিনী লুঠ করবে আর যুদ্ধের সময় লুঠ করবে শত্রুবাহিনী। এর কারণ সামান্য বেতন ছাড়া ভিন দেশের প্রতি এদের কোনো আন্তরিকতা নেই। আর তাদের প্রাপ্ত বেতনও এমন আহামরি কিছু নয় যে, তারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করতে পারে। যতক্ষণ শান্তিতে থাকবে ততক্ষণ তারা আপনার সঙ্গে থাকবে। আর যখন যুদ্ধ বাধবে তখন তারা দৌড়ে পালাবে। না-হয় বসেই থাকবে। এই সত্য প্রমাণ কষ্টসাধ্য নয়। ইতালি ধ্বংসের একমাত্র কারণই হলো দীর্ঘদিন ভাড়াটে বাহিনীর ওপর নির্ভরশীলতা। কিছু

লোককে ক্ষমতায় রাখতে তারা সাহায্য করেছে, আবার মাঝেমধ্যে নিজেদের শক্তিশালী বলেও প্রমাণ করেছে। কিন্তু বিদেশী শক্তির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ দিয়েছে তারা কত দুর্বল। এ কারণেই ফ্রান্সের রাজা অষ্টম চার্লস অনায়াসেই ইতালি দখল করে নেন। এ যেন এক টুকরো খড়িমাটি নিয়ে খেলা। অষ্টম চার্লস একজন কোয়ার্টার মাস্টারকে এক টুকরো খড়িমাটি দিয়ে পাঠিয়েছেন কোন কোন বাড়িতে ফ্রান্স বাহিনী যাবে তা চিহ্নিত করতে। যারা বলেছিলেন আমাদের দুর্ভাগ্যই এর প্রধান কারণ; তারা যে সব দুর্ভাগ্যের কথা বলেছিলেন তা আদৌ যথার্থ নয়। আমি যেভাবে বললাম সেভাবেই ঘটনা ঘটেছে। শাসকরাই এর জন্য দায়ী, এবং এর জন্য তারা শাস্তিও পেয়েছে। ভাড়াটে সেনাবাহিনীর দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির বিষয় আমি আরও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে চাই। ভাড়াটে সেনাধ্যক্ষরা যোগ্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যদি তারা যোগ্য হয়, তাহলে আপনি তাদের বিনাশ করতে পারবেন না। কারণ তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো নিজেদের বৈভব বৃদ্ধি। তারা তা করবে চাকরিদাতাদের ওপর চাপ দিয়ে, না-হয় চাকরিদাতাদের ইচ্ছার বাইরে অন্যের ওপর অত্যাচার করে। আর তারা যদি অযোগ্য হয় তাহলে ত্বরিত আপনার ধ্বংস ডেকে আনবে। এর উত্তরে আপনি যদি বলতে চান, একথা ভাড়াটে বা যেকোনো ধরনের সেনাধ্যক্ষের ব্যাপারেই প্রযোজ্য! তার উত্তরে আমি বলব, শাসক কিংবা রিপাবলিক সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করবে। শাসকের উচিত সবসময় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণের সকল দায়িত্ব নিজের হাতে রাখা। আর রিপাবলিকের ক্ষেত্রে তার কোনো প্রতিনিধিকে সেনানিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে পাঠাতে হবে। যদি এমন প্রতিনিধি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, তাহলে অবশ্যই তাকে পরিবর্তন করতে হবে। আর যদি সার্থক হন, তাহলেও আইন-কানুনের মধ্যেই তাঁকে রাখতে হবে যাতে সে তার সীমা লঙ্ঘন করতে না পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে শাসক কিংবা রিপাবলিক যারা সেনা নিয়ন্ত্রণের মূল দায়িত্বে থেকেছেন তারাই বিজয় অর্জন করেছেন। অন্যদিকে ভাড়াটে সেনারা বিপর্যয় ঘটিয়েছেন, আরো দেখা গেছে সেনা নিয়ন্ত্রণকারী রিপাবলিক বাইরের সেনাদের চেয়ে অনেক সহজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

নিজেদের সেনাবাহিনী থাকার কারণেই রোম এবং স্পার্টা বহু শতক ধরে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে; সুইসদের ছিল সুদৃঢ় সেনাদল তাই তারা ব্যাপক স্বাধীনতা ও মুক্ত জীবন উপভোগ করতে পেরেছে। অন্যদিকে কার্থাজিয়ানরা ভাড়াটে সৈন্য রাখার বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। নিজেদের নাগরিকদের মধ্যে থেকে কাউকে বাহিনীর দায়িত্ব দেয়া সত্ত্বেও রোমের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধের সময় তারা সব কিছু নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নিয়েছিলেন। ইপামিনোনডাস-এর মৃত্যুর পর থেবানরা

ম্যাসিডনের ফিলিপকে তাদের সেনাবাহিনীর প্রধান করেছিলেন। এই সেনাপতি যুদ্ধে জয়লাভ করে থেবানসদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিল। ডিউক ফিলিপের মৃত্যুর পর মিলানিয়রা ভেনেটিয়ানসদের বিপক্ষে ফ্রানসেসকো স্ফোর্জাকে নিয়োগ করে। ক্যারাভাজিয়োর যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিয়োগকর্তা মেলানিজদের উপর অত্যাচার চালায়। ফ্রানসেসকো স্ফোর্জার বাবা ন্যাপল্‌স-এর রানি জাওয়ান্নার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিরস্ত্র অবস্থায় রেখে চলে আসে। ফলে রানি রাজত্ব রক্ষার স্বার্থে আরাগনের রাজার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হন। আর যদি ভেনেটিয়ানস এবং ফ্লোরেনটিনেস আনুষ্ঠানিকভাবে ভাড়াটে সেনাদলের সাহায্যে রাজ্য বিস্তার করে থাকে এবং তাদের সেনাপতিরা নিজেদের শাসক হিসেবে ঘোষণা না করেও কেবল আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে আমি বলব, ফ্লোরেনটিনেসদের ভাগ্যই তাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এদের সাহসী সেনাধ্যক্ষ, যাদের উচ্চাভিলাসে সবাই ভীত, কিংবা তারা কোনোদিন জয়ের মুখ দেখেনি অথবা তারা কোনোদিন কোনো শত্রুর মোকাবিলা করেননি, আবার কারো দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে। যারা জয়ের পথে যাননি তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জিওভ্যানি আগুতো (জন স্পারপি) যার বিশ্বাস কখনো পরীক্ষার সম্মুখী না হয়ে নিজের অবস্থানে টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও বলা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে তিনি বিজয়ী হলে ফ্লোরেনটিনেসরা তাঁর দয়ার ওপরই নির্ভরশীল থাকত। স্ফোর্জা এবং ব্রাচচেসি সব সময় একে অপরের প্রতিপক্ষই ছিল। ফ্রানসিসকোর নজর ছিল লুমবার্ডির দিকে, অন্যদিকে ব্রাক্কিওর দৃষ্টি ছিল গির্জা এবং ন্যাপলেস রাজ্যের দিকে।

এবার আমরা দেখব সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কয়েকটি বিষয়। ফ্লোরেনটিনেসরা তাদের সেনাবাহিনীর ভার দিয়েছিল পাওলো ভিটেলির ওপর। পাওলো তার নিজের যোগ্যতায় অতি সাধারণ অবস্থান থেকে সুউচ্চ সামনে আসীন হয়েছিলেন। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে তিনি যদি পিসা দখল করে নিতেন—ফ্লোরেনটিনেস তা মেনে নিতে বাধ্য হতেন। কারণ তিনি যদি শত্রু হতেন তাহলে ফ্লোরেনটিয়ানদের কিছুই করার থাকত না। আর যদি তাকে যথাস্থানে রাখতেন তাহলে শর্তানুযায়ী তাকে মান্য করেই তার চলতে হতো।

ভোনেটিয়ানদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তারা যতদিন নিজেদের বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করেছেন ততদিন তারা সগৌরবেই এগিয়ে গেছেন। নৌপথে, যেখানে তাঁরা তাদের ওপর নির্যাতনকে নিজেদের বাহিনী নিয়ে সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন—তারা জয়ী হয়েছেন। কিন্তু যখন তাঁরা স্থলপথে যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছেন তখন যথাযথ বীরত্ব দেখাতে পারেননি। তখন তাঁরা অন্যান্য ইতালীয়

রাজ্যের মতো ভাড়াটে সেনা নিয়োগ করেছেন। ভূখণ্ড বিজয়ের শুরুতে নিজেদের সেনাপ্রধানদের দিক থেকে তেমন ভয় ছিল না। কারণ তাদের খ্যাতি ছিল সুউচ্চ। অথচ নিজেদের দখলে থাকা ভূখণ্ড ছিল সে তুলনায় অতি সামান্য। কিন্তু কারমিগনুওয়ালার বদৌলতে অধিকৃত ভূখণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা তাদের ত্রুটি বুঝতে পারেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে তাঁর কঠিন অবস্থানের কারণেই মিলানের ডিউককে পরাজিত করতে পেরেছিলেন। তারপরও ভবিষ্যৎ যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁর ঐ আন্তরিকতার অভাব অনুভব করে এই সেনাপতির নিয়ন্ত্রণে আর কোনো বিজয়ের আশা ত্যাগ করে। তারপরও তাঁরা যা অর্জন করেছেন তা হারাবার আশঙ্কায় তাকে বরখাস্ত করার সাহস পেলেন না। বরং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে তাঁকে হত্যা করাই শ্রেয় বলে বিবেচিত হলো।

এরপর ভ্যানেটিয়ানসরা সেনাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দিল বারটোলোসিও দ্য বেরগামো, রবোর্তো দ্য সান সাভেরিনো, কন্‌তে দ্য পিতিলিয়ানো এবং এরকম আরো অনেককে, যাঁদের কাছ থেকে লাভের আশার চেয়ে ক্ষতির ভয় ছিল বেশি। পরবর্তী দফায় ভেইলাতে তেমন ঘটেছিল। সেখানে এক যুদ্ধে দীর্ঘ আটশত বছরের শ্রম আর অধ্যবসায়ে যা অর্জন করেছিল তা হারাতে হলো। কারণ এ ধরনের অর্জন দুর্বল এবং গতিহীন, অথচ ক্ষতি বেশ গতিশীল এবং অসাধারণ।

সুদীর্ঘকাল ভাড়াটে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে আমি ইতালির দৃষ্টান্ত দিয়ে এত কথা বললাম। এখন এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমি একটি পুরনো বিষয় উপস্থাপন করব। যাতে এই পদ্ধতির শুরু এবং প্রাগ্রসর গতি দেখে একে সংশোধন করে উন্নত কোনো পদ্ধতির কথা ভাবা যায়। তোমরা নিশ্চয়ই জান প্রাচীনকালে রোম সাম্রাজ্য যখন ক্ষমতা হারাতে থাকে সেই সঙ্গে পোপের পার্থিব প্রভাব বাড়তে থাকে, তখন ক্রমে ইতালি একাধিক ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অনেক বড় বড় নগর তাদের অভিজাতদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং সম্রাটের উৎসাহে তাদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়। যাজক সম্প্রদায় গির্জার ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার করে অভিজাতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সহায়তা করে। আবার কোনো কোনো নগরীতে কোনো নাগারিক চূড়ান্ত ক্ষমতা দখল করে নিয়ে নিজেকেই নগরীর সম্রাট ঘোষণা করেন। এভাবে ক্রমে ইতালি গির্জা এবং নাগরিকদের অধীনে চলে যায়। কিন্তু এই যাজক নাগরিকেরা অস্ত্র চালনায় পারদর্শী না হওয়ায় নিজেকে রক্ষার জন্য ভাড়া করা সেনা নিয়োগ দেন। এমন ভাড়াটে সেনা নিয়োগ করে প্রথম খ্যাতি লাভ করেন রোমাগনার নাগরিক আলবেরিও দ্য কোমো। তার নিয়ন্ত্রণেই ব্রাচ্চিও এবং স্ফোর্জা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। এরাই পরে ইতালির শক্তিশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা

ইতালির সেনাদলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা সবাই এদের উত্তরাধিকারী। তাদের এই শৌর্যবীর্যের পরিণতিতে ইতালি বিধ্বস্ত হয়েছে ফ্রান্সের অষ্টম চার্চের হাতে। দ্বাদশ লুইয়ের হাতে হয়েছে লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। অত্যাচারিত হয়েছে স্পেনের ফারডিন্যান্ড এর হাতে এবং নিগৃহীত ও অপমানিত হয়েছে সুইচদের দ্বারা।

ভাড়াটে সেনারা তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর প্রভাব ও কৃতিত্ব দেখানোর জন্য প্রথমেই সকল রাজ্যে পদাতিক বাহিনীকে খর্ব করে শেষ করে দেবার উদ্যোগ নেয়। এর কারণ তাদের নিজেদের দেশ বলে কিছু ছিল না, তারা ভাগ্যচক্রে সেনানিয়ন্ত্রক। ছোটো পদাতিক বাহিনী দ্বারা তারা কোনো সুনাম অর্জন করতে পারত না। অন্যদিকে বড় কোনো দল নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। সে কারণে তারা অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাহিনী ছোটো হওয়ায় তাদের নিয়ে তাৎক্ষণিক কোনো কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃতিত্ব দেখানো সহজ এবং সেই সঙ্গে তাদের রক্ষণাবেক্ষণও সুবিধাজনক। এভাবে তারা স্থির করল যে, কুড়ি হাজারের সেনাবাহিনীর মধ্যে দুই হাজারের বেশি পদাতিক বাহিনী থাকবে না।

এছাড়া তারা সব সময়ই কোনো বড় ঝুঁকি বা বিপদ এড়িয়ে মূলত নিজেরা কখনই মারামারি করত না। প্রতিপক্ষকে হত্যা করত না; প্রয়োজনে বন্দি করত আবার বিনা কারণে তাদের মুক্তি দিত। রাতে কোনো দুর্গে আক্রমণ করত না। যারা দুর্গে থাকত তারাও তাবুর ওপর আঘাত করত না। তারা শিবিরের চারদিকে পরিখা খনন করত না, এবং শীতে কখনো বাইরে থাকত না। এই সব বিষয়ই ছিল তাদের রণনীতি অনুমোদিত। এসবই তারা করত আমরা যেভাবে বলেছি, পরিশ্রম এবং বিপদ এড়িয়ে চলার জন্য। এভাবে ভাড়াটে সেনাবাহিনী নিয়োগের কারণেই ইতালির অবস্থা অসম্মানজনক এবং দাসত্বের পর্যায়ে নেমে আসে।

পরিচ্ছেদ তেরো

সাহায্যকারী, মিশ্র এবং জাতীয় বাহিনী প্রসঙ্গ

সাহায্যকারী বাহিনী, যাদের আমি পূববর্তী অধ্যায়ে অকার্যকর বলে উল্লেখ করেছি। এ হলো নিজের বিপদে নিজেকে রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী মিত্রের কাছ থেকে চেয়ে আনা কোনো বাহিনী। যা সম্প্রতি দ্বিতীয় পোপ জুলিয়াস করেছিলেন। ফেরারা অভিযানের সময় ভাড়াটে সৈন্যদের চরম ব্যর্থতা দেখে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য সাহায্যকারী সেনা ডেকেছিলেন।

নিজেকে রক্ষা করার জন্য স্পেনের রাজা ফারডিন্যান্ড-এর কাছ থেকে তিনি সাহায্যকারী মিত্রবাহিনী এনেছিলেন।

এমন বাহিনী তাদের নিজেদের জন্য ভালো এবং কার্যকর। কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য অনুরোধ করে এদের আনলে তা সবসময়ই বিপজ্জনক হবে। কারণ পরাজিত হলে তাঁর কিছুই করার থাকে না; আর বিজয়ী হলে সেই বাহিনীর কাছে তিনি যেন জিম্মি হয়ে যান। প্রাচীন ইতিহাসে এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ আছে। কিন্তু আমি আবার দ্বিতীয় পোপ জুলিয়াসের দৃষ্টান্তই সামনে আনব; কারণ এই ঘটনা এখনো আমাদের মনে তরতাজা। তাছাড়া এক্ষেত্রে তাঁর আচরণের বিষয়টি অন্য যে-কোনো ঘটনার চেয়ে লজ্জাজনক। কারণ ফেরারা দখল করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তবে তাঁর কপাল ভালো যে এসময় এমন একটি অভাবিত ঘটনা ঘটল যা তাঁকে তাঁর ভুলের পরিপূর্ণ মাসুল দেয়া থেকে রক্ষা করেছিল। তাঁর সাহায্যকারী সেনারা র‍্যাভেনায় পরাজিত হলো, অকস্মাৎ সুইচরা জেগে উঠল এবং বিজয়ীদের বিতাড়িত করল। এভাবে দ্বিতীয় জুলিয়াস তাঁর শত্রু কিংবা সাহায্যকারী সেনাদের হাতে বন্দি হওয়া থেকে রক্ষা পেলেন। তাঁর শত্রুরা সাহায্যকারী সেনাদের কাছে পরাজিত হয়নি, পরাজিত হয়েছিল অন্য কারো কাছে।

নিজস্ব কোনো সেনা না থাকা সত্ত্বেও পিসা দখল করার উদ্দেশ্যে ফ্লোরেনটাইনরা ফ্রান্স থেকে দশ হাজার সেনা ভাড়া করেছিল। এটা ছিল তাঁদের যে-কোনো বড় বিপদের চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। প্রতিবেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কনসট্যান্টিনোপল-এর সম্রাট দশ হাজার সেনাকে গ্রিসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাল, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পরও তারা সেখান থেকে চলে যেতে চাইল না। আর এভাবেই

অবিশ্বাসীদের কাছে গ্রিসের দাসত্বের সূচনা।

যারা বিজয়ী হতে চান না তাদের জন্য সাহায্যকারী সেনা নিয়োগই যথার্থ। কারণ এরা ভাড়াটে সেনাবাহিনীর চেয়েও বিপজ্জনক। সাহায্যকারী সেনাদের হাতে ধ্বংস অনিবার্য। এরা ঐক্যবদ্ধভাবে অন্যদের প্রতি অনুগত। ভাড়াটে সেনাদের ক্ষেত্রে তারা জয়লাভ করলে আপনার ক্ষতি করতে তাদের বেশ সময় এবং সুযোগ প্রয়োজন হয়। কারণ এরা একতাবদ্ধ নয়। এরা আপনার বেতনভূক এবং এদের প্রধান আপনারই নিয়োগ দেয়া কেউ। কোনো তৃতীয় পক্ষের তাৎক্ষণিক ক্ষমতা অর্জন করে আপনার ক্ষতি করা সহজ নয়। সংক্ষেপে ভাড়াটে সেনাদের নিয়ে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো তাদের ভীরুতা এবং অবিশ্বাস। অন্যদিকে সাহায্যকারী সেনাদের নিয়ে বিপদ হলো তাদের সাহসিকতা।

এই সব কারণে একজন বুদ্ধিমান শাসক এ ধরনের সেনা নিয়োগ পরিহার করে একান্ত নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলেন। ধার করা বাহিনী নিয়ে বিজয়ী হওয়ার চেয়ে নিজস্ব বাহিনী নিয়ে পরাজিত হতেই এরা বেশি পছন্দ করেন। এর প্রমাণ হিসেবে আমি সিজার বর্জিয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে সঙ্কোচ বোধ করব না। এই ডিউক সাহায্যকারী সেনাবাহিনী নিয়ে রোমাগনায় প্রবেশ করেন। শুধু ফ্রান্স বাহিনী নিয়ে তিনি ইমোলা ও ফোরলি দখল করেছিলেন। কিন্তু পরে ভাবলেন এই বাহিনী পুরোপুরি বিশ্বস্ত নয়। তাই তিনি আরো সেনা ভাড়া করলেন, যাদের তিনি কম বিপজ্জনক ভেবেছেন। ভাড়া করলেন ওরসিনি ও ভিটেলিদেরও। কিন্তু এরা নিজেদের আচরণে প্রমাণ করল যে তারা অনির্ভরশীল, অবিশ্বাসী এবং বিপজ্জনক। ফলে ডিউক এদের দমন করে নিজস্ব বাহিনীর ওপর নির্ভর করলেন। এই ধরনের সেনাদের একের সঙ্গে আর একের তফাৎটা সহজেই অনুমান করা যায় যখন ডিউক ভ্যালেনটিনোর নিয়োগ করেন ওরসিনি এবং ভিটেলি বাহিনী এবং শেষে তার নিজস্ব বাহিনী ছাড়া আর কেউ থাকে না। এই কৃতিত্ব ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিউকের কোনো উচ্চাভিলাষ নয় বরং নিজের বাহিনীর নিয়ন্ত্রক হয়েই এই সার্থকতা অর্জন সম্ভব।

আমি ইতালি এবং সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত থেকে সরে যেতে পারি না। সাইরাকাসের হাইরোকেও বাদ দিতে পারি না, এদের একজনের বিষয় আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সাইরাকাজিয়ান বাহিনীর প্রধান হয়ে তিনি দেখলেন ভাড়াটে বাহিনী তেমন কার্যকর নয়। ইতালির নিয়মেই এদের অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। হাইরোর বেলায় দেখা গেল, তিনি তাদের রাখেননি এবং নিরাপদে চাকরিচ্যুত না করে সবাইকে হত্যা করে কুঁচি কুঁচি করে কেটে ফেললেন। তারপর কেবল নিজের বাহিনী নিয়েই যুদ্ধ করে চললেন।

বিষয়টি আরও ভালো করে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে একটি ঘটনা স্মরণ করব। ডেভিড যখন ফিলিস্টাইন বুলে এবং গোলিয়াথের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে প্রস্তাব পেলেন সউল তখন তাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে নিজের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে চাইলেন। ডেভিড তা গ্রহণে অসম্মতি জানালেন। বললেন এইসব নিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ করতে পারবেন না। তাই তিনি নিজের ছুরি এবং গুলতি দিয়ে মোকাবেলা করতে চাইলেন। সংক্ষেপে বলা যায় অন্য অস্ত্রশস্ত্রে ঠিক তাকে মানায় না। এগুলো হয় খুব বড়, যা তার পিঠ থেকে ঝুলে থাকবে, অথবা এত ভারি যে তাকে কুব্জ করে দেবে অথবা অতিরিক্ত আঁটসাঁট যা সে বহন করতে পারবে না।

একাদশ লুইসের বাবা ফ্রান্সের রাজা সপ্তম চার্লেস সৌভাগ্যক্রমে এবং সাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজদের হাত থেকে ফ্রান্সকে স্বাধীন করেছিলেন। তিনি নিজস্ব সৈন্যদলের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিলেন এবং নিজের রাজ্যে পদাতিক ও সশস্ত্র সেনাদল গড়ে তুললেন। পরবর্তীকালে তাঁর ছেলে একাদশ লুইস নিজস্ব পদাতিক বাহিনী ভেঙে দিয়ে তার পরিবর্তে সুইচ সেনা ভাড়া করলেন। এই ভুল সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তী সময়ে আরো নানা কারণে এমন বিপদ ঘটল যে, রাজ্যের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ল। এইসব কারণের মধ্যে সুইস বাহিনীকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া, লুইসের নিজের বাহিনীর মনোবল দুর্বল করা এবং পদাতিক বাহিনীর বিলুপ্তি ঘটানো অন্যতম। নিজের বাহিনীকে সুইচ বাহিনীর সহায়ক হিসেবে দেখায় তাদের ধারণা হয়েছিল যে সুইচ বাহিনী দ্বারা তাঁরা কোনো যুদ্ধ জয়ে সক্ষম নন। বিষয়টি এমন দাঁড়াল যে সুইচ ছাড়া ফ্রান্স টিকতেই পারে না এবং তাদের সমর্থন ছাড়া কোনো প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এভাবে ফ্রান্সের সেনাবাহিনী একটি মিশ্রবাহিনীতে পরিণত হলো। অর্থাৎ অংশত নিজস্ব বাহিনী আর বাকি ভাড়াটে বাহিনী। অবশ্য সাহায্যকারী বাহিনী কিংবা শুধু ভাড়াটে বাহিনীর চেয়ে এ অনেকটা ভালো। তবে এটা ঠিক, একান্ত নিজস্ব বাহিনীর তুলনায় এই বাহিনী (মিশ্র) অনেক নিকৃষ্ট। এই দৃষ্টান্ত যথেষ্ট অর্থবহ। ফরাসি রাজ্য আরও দৃঢ় ও অজেয় হতো যদি সপ্তম চার্লেসের গড়া বাহিনীকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং আরো বড় করা হতো। কিন্তু মানুষের অদূরদর্শিতা সাময়িক যাকে ভালো মনে করে তাকেই গ্রহণ করে, ভেবেও দেখে না যে এর ভিতরে কী বিষ লুকায়িত আছে—যেমন আমি আগেই ক্ষয়জ্বরের কথা বলেছিলাম।

যিনি তাঁর সামনের বিপদগুলো যথাসময় সনাক্ত করতে পারেন না তিনি কখনো ভালো শাসক হতে পারেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এই গুণ খুব কম লোকেরই থাকে। আমরা যদি রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসের শুরুর দিকে তাকাই তাহলে

দেখা যাবে এর মূল উৎস ছিল সেনাবাহিনীর জন্য গোথদের ভাড়া করা। এই থেকেই রোম সাম্রাজ্যে ঘুণ ধরে। রোমানদের যা কিছু অর্জন সব চলে গেল গোথদের হাতে।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, নিজস্ব বাহিনী না থাকলে কোনো শাসকই নিরাপদ নন। বিপদ বা দুর্যোগের সময় যদি নিজের শক্তির ওপর দাঁড়াতে না পারেন তাহলে ভাগ্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন। প্রাজ্ঞজনরা বলেন, শাসকের একান্ত নিজস্ব ক্ষমতার বাইরে তাঁর ক্ষমতা এবং সুনামের চেয়ে দুর্বল এবং ক্ষয়িষ্ণু আর কিছু নেই। এ থেকে আমি বলতে চাই নিজের প্রজা, নিজ দেশবাসী, অথবা নিজের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তির বাইরে অন্যদের নিয়ে গড়ে ওঠা সেনাবাহিনী হয় ভাড়াটে, না-হয় সাহায্যকারী দল।

মহাবীর আলেকজান্ডারের পিতা মেসিডোনের ফিলিপ এবং আরও বহু প্রজাতন্ত্র এবং শাসক যেভাবে নিজের চেষ্টা, শক্তি, দক্ষতা এবং পদ্ধতিতে নিজস্ব বাহিনী গড়ে তুলেছেন তাঁদের দৃষ্টান্তই সবক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায়।

পরিচ্ছেদ চৌদ্দ

প্রতিরক্ষা বিষয়ে শাসকের কর্তব্য

রণকৌশল নির্ধারণ, সেনাবাহিনী সংগঠন এবং সুশৃঙ্খলভাবে তা পরিচালনা করার বাইরে একজন শাসকের মনে, মননে ও চর্চায় আর কোনো বিষয় থাকতে পারে না। থাকতে পারে না অন্য বিশেষ কোনো চর্চার বা অধ্যয়নের বিষয়। একজন আদেশ দাতার কাছে এই কৌশল (রণকৌশল) ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করার নেই। এ এমন এক শক্তি যা যারা হয়ে জন্মায় তাদেরকেই সমুন্নত করে না বরং সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করা কোনো ব্যক্তিকে শাসকের পর্যায় উন্নীত করতে পারে। অন্যদিকে দেখা গেছে যেসকল শাসক নিজের সেনাবাহিনী দিয়ে বিলাশবৈভবে ব্যস্ত থাকেন তিনি তাঁর রাজ্যই হারিয়ে বসেন।

এভাবে রণনীতিকে অবজ্ঞা করাই রাজ্য হারানোর মূল কারণ। আর তা অর্জন করতে তাকে বিশারদ হতে হয়। ফ্রানসেসকো স্ফোর্জা সমরবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ায় সাধারণ নাগরিক থেকে মিলানের ডিউক হয়েছিলেন। আর তাঁর উত্তরসূরিরা পরিশ্রম এড়াতে এবং অস্ত্র পরিচালনার ভীতির কারণে ক্রমে সাধারণ নাগরিকে পরিণত হয়।

শাসকের বিপর্যয়ের অন্যান্য খারাপ বিষয়গুলোর মধ্যে যথাযথ সামরিক শক্তির ঘাটতি বা অনুপস্থিতি অন্যতম। এর কারণে একজন শাসক বিপর্যস্ত এবং অন্যের কাছে অবজ্ঞা বা ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়েন। যা প্রজাসাধারণের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয় বরং তাঁর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন সশস্ত্র ব্যক্তির সঙ্গে একজন নিরস্ত্র মানুষের তুলনাই হয় না। এটা মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে না যে, একজন সশস্ত্র ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে একজন নিরস্ত্র ব্যক্তিকে মেনে চলবে। সেনাবাহিনীবিহীন কোনো শাসকই তাঁর সশস্ত্র প্রজাসাধারণের মধ্যে নিরাপদ থাকতে পারেন না। একজন অবজ্ঞাকারী এবং একজন অবিশ্বাসী মিলে একসঙ্গে কাজ করতে পারে না। যে শাসক রণবিদ্যায় পারদর্শী নন আর সকল দুর্ভাগ্যের বাইরে তিনি নিজের সেনাদের সম্মান পেতে কিংবা তাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন না। যুদ্ধের সময় যেমন, শান্তির সময়ও তেমনি যুদ্ধের অনুশীলন করতে হবে। দুইভাবে তিনি তা করতে পারেন। নিয়ম অনুযায়ী তিনি কেবল সুশৃঙ্খল এবং চর্চা কিংবা অনুশীলনের মধ্যে থাকবেন না বরং ঘন ঘন শিকার করতে বের হবেন

যাতে শরীরটা কঠোর শ্রমের জন্য প্রস্তুত থাকে। তিনি রাষ্ট্রের নানা বৈচিত্র্য সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকবেন। জানবেন কোথায় কীভাবে পর্বতগুলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, উপত্যাকাগুলো সঙ্কীর্ণ আর সমতল ভূমি বিস্তীর্ণ। তিনি জানতে শিখবেন নদী আর জলাভূমির বিচিত্র রূপ। এই সকল ব্যাপারেই তার গভীর মনোযোগ থাকতে হবে। কারণ এই জ্ঞান শাসকের কাছে নানাভাবে মূল্যবান। তিনি যদি নিজের দেশকে জানতে শেখেন, সেই জ্ঞান দেশরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অন্যদিকে কোনো দেশ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা তিনি অন্যদেশের বৈচিত্র্যকে তুলনা করে দেখতে পারেন, যা কোনোকিছু বোঝার জন্য জরুরি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় টাসকেনির পাহাড়, উপত্যকা, সমতলভূমি, নদী এবং জলাভূমির সঙ্গে অন্যপ্রদেশের (এগুলোর) যথেষ্ট মিল আছে। সুতরাং কোনো দেশের বৈচিত্র্য এবং গঠন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে সহসাই অন্য দেশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। একজন কমান্ডারের জন্য অতি আবশ্যকীয় এমন দক্ষতার অভাব প্রত্যাশিত নয়। কারণ এই জ্ঞানই তাকে বলে দেবে কেমন করে শত্রু চেনা যাবে, কোথায় কেমন করে শিবির স্থাপন করতে হবে, কীভাবে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কেমন করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে এবং কীভাবে সামনে এগিয়ে যাবার পথ অবারিত থাকবে।

এ্যাচায়েন্স-এর শাসক ফিলোপোয়েমেনকে প্রশংসা করে যত লেখক যত কথা লিখেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো, শান্তির সময় তিনি সর্বদা রণনীতি নিয়েই ভাবতেন। বন্ধুদের সঙ্গে যখন বেড়াতে বেরুতেন, মাঝে মাঝে পথে দাঁড়াতেন এবং প্রশ্ন করতেন: 'মনে কর কাছের এই পাহাড়ের উপর শত্রুবাহিনী, আর আমরা আমাদের বাহিনী নিয়ে এই এখানে—তাহলে কার পক্ষে সুবিধে? সকল নিয়মরীতি মেনে কীভাবে আমরা নিরাপদে শত্রুর কাছে যাব? আমরা যদি পশ্চাদপসরণ করতে চাই, তাহলেই-বা কেমন করে তা করব কিংবা যদি শত্রু বাহিনী পিছু হটে, আমরা কীভাবে তাদের অনুসরণ করব, পথে চলতে চলতে তিনি তাঁদের সামনে প্রতিরক্ষা বিষয়ে যে সকল সঙ্কট আসতে পারে সেগুলোর উল্লেখ করে সহযাত্রীদের মতামত নিতেন। নিজের মতামত জানাতেন যুক্তিসহকারে। ফলে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেবার সময় এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন না, যার যথাযথ প্রতিবিধান তাঁর অজানা। মনন চর্চার জন্য শাসকের ইতিহাস পাঠ, খ্যাতিমান ব্যক্তিদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ-গবেষণা জরুরি। দেখতে হবে কেমন ছিল তাদের রাজনীতি। বিশ্লেষণ করতে হবে তাদের জয়-পরাজয়ের কারণ। যাতে তিনি নিজে জয়ের পথ খুঁজে পান এবং পরাজয়ের সম্ভাবনাকে এড়াতে পারেন। কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন অতীতের কোনো ব্যক্তিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাঁকে অনুসরণ করা।

দেখতে হবে তাঁরা কীভাবে গৌরবান্বিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। এসব মনে রাখতে হবে নিজের ভবিষ্যতের জন্য। যেমন বলা হয়ে থাকে মহাবীর আলেকজান্ডার অনুসরণ করেছেন এচিল্লেসকে, আবার সিজার অনুসরণ করেছেন আলেকজান্ডারকে। যেমনি সিপিও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সাইরাসকে। যেনোফেন রচিত সাইরাসের জীবনী যিনি পড়েছেন তিনি নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন না যে সিপিও-র জীবনে এই অনুকরণ কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেনোফেন রচিত জীবনী সাইরাসের গুণাবলি যেমন ভোগবিলাস, তাঁর অমায়িক আচরণ, মানবতা এবং উদারতা কীভাবে সিপিও-র জীবনে কার্যকর থেকেছে ইত্যাদি জানায়।

একজন বিচক্ষণ শাসকের এভাবেই চলা উচিত এবং তিনি শান্তির সময়েও অলস বসে থাকবেন না। এসব অনুশীলনে অধ্যবসায় থাকতে হবে যাতে ভাগ্যের পরিবর্তনে কিংবা আঘাতে তিনি বিচলিত হয়ে না পড়েন। যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনি থাকবেন সদা সচেতন।

পরিচ্ছেদ পনেরো

যে সকল কারণে মানুষ বিশেষ করে শাসক প্রশংসিত কিংবা নিন্দিত হন

এবার জানা প্রয়োজন একজন শাসক তার প্রজাসাধারণ এবং বন্ধুদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন। বিষয়টি নিয়ে অনেকেই লিখেছেন। এদের অনেকের সঙ্গে আমি সমমত পোষণ করি না। ফলে আমার এই কাজকে অনেকে ধৃষ্টতাপূর্ণ মনে করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু আমার উদ্দেশ্য তাদের জন্য এমন কিছু লিখব যা তাদের প্রয়োজনে লাগবে। আমার বিশ্বাস বিষয়টি নিয়ে কল্পনার চেয়ে বাস্তবতার দিকে আগানোই যথাযথ হবে। অনেকেই গণরাজ্য এবং অধিরাজ্যের কল্পনা করেছেন। বাস্তবে কোনোদিনই এর দেখা মেলেনি। মানুষের যেভাবে চলা উচিত, আর যেভাবে চলেন—তার মধ্যে দেদার ফারাক। যিনি স্বাভাবিক নিয়মে চলেন সেভাবে তার চলা ঠিক নয়, তা তাকে রক্ষার পরিবর্তে বরং ধ্বংসের দিকেই ঠেলে দেয়। যেমন একজন মানুষ যিনি ভালোর মধ্যে থাকেন এবং ভালোর চর্চা করেন তিনি নিজের ধ্বংসের যথার্থ কাজটিই করেন। কোনো শাসক নিজেকে রক্ষা করতে চাইলে তাকে বুঝতে হবে সব সময় ভালো থাকা যায় না। তবে তা নির্ভর করবে প্রয়োজনের ওপর।

শাসকের কল্পিত বিষয়গুলো পাশে রেখে কেবলমাত্র বাস্তবতার নিরিখে আমি বলব, কোনো মানুষ বিশেষ করে শাসকবৃন্দ যিনিই উচ্চাসনে আসীন হন, কিছু গুণাবলির গুণেই তিনি প্রশংসিত অথবা নিন্দিত হন। এভাবে কেউ বিবেচিত হন উদার হিসেবে আবার কেউ কৃপণ বলে। (যেমন তিনি ধনলোভী যিনি সব কিছু লুঠ করতে উদগ্রীব, আর কৃপণ বলব তাকে যিনি নিজেকে ভোগ করার ব্যাপারে দশ প্রস্থ দূরে থাকেন)। কেউ হবেন পুরোপুরি উদার, কেউ লোলুপ, কেউ হবেন নিষ্ঠুর আবার কেউ দয়ালু। কেউ বিশ্বস্ত আবার কেউ বিশ্বাসভঙ্গকারী। কেউ পৌরুষহীন দুর্বল, কেউ তেজস্বী। আবার কেউ হিংস্র এবং সাহসী। কেউ অমায়িক দুর্বল কেউ গর্বিত ও উদ্ধত। কেউ কামুক, কেউ সতীসাধ্বি। কেউ সহজ সরল, কেউ ধূর্ত। কেউ দৃঢ় অনড়, কেউ দুর্বলচিত্ত। কেউ সাচ্চা খাঁটি, কেউ অসার তুচ্ছ। কেউ ধার্মিক, কেউ নাস্তিক এবং আরও নানান রকম।

আমি নিশ্চিত যে একজন শাসকের জন্য উপরে উল্লিখিত ভালো গুণগুলো আয়ত্ব

করার চেয়ে আর কিছু নেই। কিন্তু এই সকল গুণ একসঙ্গে আয়ত্ব করাও সম্ভব নয়, এমন-কি দেখাও সম্ভব নয়। কারণ তাঁর মানসিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এটা সম্ভব নয়। তাহলে দেখতে হবে রাজ্য হারানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ পঙ্কিলতাকে কীভাবে পরিহার করা যায়। যদি সম্ভব হয় সেই সকল বিষয়কে প্রতিরোধ করা যা ক্ষতির কারণ হতে পারে। আর, যদি তা সম্ভব না-হয় তাহলে নির্দ্বিধায় তার স্বাভাবিক প্রবাহমানতাকে অনুসরণ করতে হবে, কিছু কিছু ত্রুটি নিয়ন্ত্রণের ভার নিজের কাঁধে নেয়া প্রয়োজন; তা না থাকলে তাঁর পক্ষে রাজ্য রক্ষাই কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যাবে কোনো কোনো বিষয় আপতদৃষ্টিতে গুণ বলে মনে হলেও তাকে অনুসরণ করলে ধ্বংসই ডেকে আনবে। অন্যদিকে আপাতদৃষ্টিতে খুঁত বা ত্রুটি মনে হলেও তা নিরাপত্তা এবং কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

পরিচ্ছেদ ষোলো

বদান্যতা এবং মিত্যব্যয়িতা প্রসঙ্গে

উল্লিখিত দুটি গুণের মধ্যে আমি বলব, একজন শাসকের বদান্য বলে পরিচিত হওয়াই ভালো। তা সত্ত্বেও শব্দটি যেভাবে প্রচলিত তাতে আতঙ্কিত হবার কারণ না থাকলেও ক্ষতির সম্ভাবনা থেকেই যায়। কারণ বদান্যতার যথাযথ চর্চা যা থাকা উচিত, কখনই স্বীকৃতি পাবে না; বরং এর বিপরীত ত্রুটিই বেশি বর্তাবে। আপনি উদার হিসেবে পরিচিত হতে চাইলে কোনো পর্যায়েই ব্যয় করা থেকে থামবেন না। এভাবে একজন শাসক স্বাভাবিকভাবে সকল ধনসম্পত্তি করায়ত্ব করতে পারেন। এবং শেষে যদি তিনি উদার হিসেবে নিজের নাম অক্ষুণ্ন রাখতে চান তাহলে প্রজাসাধারণের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে হবে। করের বোঝা বাড়াতে হবে, অর্থ উপার্জনের যত পথ আছে সকল পথ অবলম্বন করতে হবে। যা তাঁকে জনগণের কাছে সহজেই নিন্দনীয় করে তুলবে। যখন তিনি দরিদ্র হবেন তখন সকলে তাকে অবজ্ঞা করবে। ফলে এমন বদান্যতার পরিণতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অনেকে। আর উপকৃত হবেন অতি সামান্য কজন। প্রথমে তিনি নানা দুর্ভোগে জর্জরিত হবেন এবং সকল প্রকার বিপদ তাঁকে ঘিরে ধরবে। যখন তিনি বিষয়টি বুঝতে পেরে খরচ কমাবার উদ্যোগ নেবেন তখন সকলের কাছে কৃপণ বলেই অভিহিত হবেন।

একজন শাসক এভাবে নিজের ক্ষতি না করে বদান্যতা দেখালে সাধারণত স্বীকৃতি পেতে পারেন। অন্যদিকে তিনি এগুলো অবহিত হলে এবং তিনি বিচক্ষণ হলে, মিতব্যয়ী বা কৃপণ বলে অভিহিত হতে আপত্তি করবেন না। কিছুদিন পর দেখা যাবে তার বিচক্ষণতা ও মিতব্যয়িতা তাঁর কোষাগার পরিপূর্ণ করতে সহায়ক হয়েছে, এবং যুদ্ধের সময় নিজের প্রতিরক্ষা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। জনগণের উপর নতুন বোঝা না চাপিয়ে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছেন। যাদের কাছ থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করবেন না তাদের কাছে বদান্য ব্যক্তি হিসেবেই পরিচিত হবেন; এর সংখ্যা প্রচুর। আর যাদেরকে তিনি কিছুই দেবেন না তারা তাঁকে জানবেন কৃপণ হিসেবে, যদিও এদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

আমাদের কালে মিতব্যয়ী হিসেবে পরিচিত নন এমন কেউ কোনো মহত কাজ করেছেন বলে আমরা দেখিনি; অন্যরা সব ধ্বংস হয়ে গেছেন। পোপ দ্বিতীয়

জুলিয়াস পদপ্রাপ্তিতে (পোপের পদ) তার বদান্যতার সুনাম কাজে লাগিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু পরে তিনি সেই সুনাম ধরে রাখতে পারেননি যাতে ফ্রান্সের রাজার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে পারেন। অথচ প্রজাদের উপর বিশেষ কোনো কর আরোপ না করেই দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। এই দীর্ঘ আর্থিক সচ্ছলতা যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহে সহায়ক হয়েছে।

স্পেনের বর্তমান রাজা যদি তাঁর বদান্যতার সুনাম ধরে রাখতে চাইতেন তাহলে নিশ্চয় এতগুলো অভিযান চালাতে এবং তাতে সফল হতে পারতেন না। একজন শাসক তাহলে নিজের প্রজাদের ওপর লুঠতরাজ না চালিয়ে, যদি নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন এবং তিনি নিজে দরিদ্র কিংবা দুর্দশাগ্রস্ত কিংবা লোলুপ না হতেন— তাহলে নিজেকে মিতব্যয়ী বা কৃপণ ভাবতে সঙ্কোচ করতেন না। কারণ এর যে-কোনো একটি তাঁর অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য সহায়ক। এবং যদি বলা হয় যে জুলিয়াস সিজার তাঁর বদান্যতার গুণেই সম্রাট হবার ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছিলেন আবার অনেকে একই সুনামের জন্য সর্বোচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন; তাহলে আমি বলব আপনি ইতোমধ্যেই শাসক হয়ে গেছন, অথবা হবার পথে। প্রথমটির বিচারে বদান্যতা আপনার জন্য অন্যায় কাজ, কিন্তু দ্বিতীয়টির ব্যাপারে বদান্যতা গুণ অতি প্রয়োজনীয়। সিজারের উদ্দেশ্য ছিল রোম সাম্রাজ্যের ওপর পুরো অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু রোম দখলের পর তিনি যদি বেঁচে থাকতেন এবং ব্যয় সঙ্কোচন না করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর অপচয়ে গোটা সাম্রাজ্যই ধ্বংস করে ফেলতেন।

কেউ হয়ত বলবেন যে, অসংখ্য শাসক আছেন যারা সেনাবাহিনীর সাহায্যে অনেক মহৎ কাজ সম্পাদন করেছেন, তাঁরা আবার বদান্য ব্যক্তি হিসেবেও বেশ পরিচিত। আমি বলব একজন শাসক নিজের কিংবা প্রজাদের সম্পদ কিংবা অন্য কারোর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। প্রথম দুটির ক্ষেত্রে তিনি হবেন মিতব্যয়ী কিন্তু অন্যের অর্থ ব্যয়ে বদান্যতায় কোনো কার্পণ্য করবেন না। সেই সকল শাসকই বেশি বদান্যতা দেখাতে পারেন যিনি নিজেই তার সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন আর লুঠতরাজ করেন, ধ্বংসযজ্ঞ চালান এবং সম্পদ আহরণ করেন মুক্তিপণের মাধ্যমে আর ব্যতিব্যস্ত থাকেন অপরের ধনসম্পদ নিয়ে। এসব না করলে সেনারা তাঁর বাধ্যগত থাকবে না। নিজের এবং নিজের দেশের প্রজাদের না-হলে এই সম্পদ শাসক উদারভাবে খরচ করতে পারেন। যেভাবে সাইরাস, সিজার এবং আলেকজান্ডার করেছিলেন। অন্যের সম্পত্তি ব্যয় করায় কারুর খ্যাতি কমে না বরং বাড়ে। ক্ষতি কেবল নিজের সম্পদ ব্যয়ে।

বদান্যতার মতো এমন আর কিছু নেই যা এত সহজে লীন হয়ে যেতে পারে। কারণ

ব্যবহার করলে ব্যবহার করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলে যা তাঁকে দরিদ্র কিংবা অবজ্ঞার পাত্র করে তোলে। অথবা দারিদ্র্যের অভিশাপ এড়াতে তাকে লোভী এবং ঘৃণার পাত্র করে তুলবে। এবং এই সকল বিষয় সম্বন্ধে শাসককে অবশ্যই সচেতনভাবে সতর্ক হতে হবে। যাতে প্রজাসাধারণের কাছে দায়ী এবং ঘৃণার পাত্র হয়ে না থাকতে হয়।

বদান্যতা যে-কোনো দিকে নিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কৃপণ নাম নেয়াটাই বিজ্ঞতার পরিচায়ক যা তোমাকে ঘৃণা না করে অভিযুক্ত করবে। উদার বদান্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে যদি লোভী হয়ে ওঠা বুঝায় তাহলে একই সঙ্গে অপমান ও ঘৃণা দুইয়ের ভাগিদার হতে হবে।

পরিচ্ছেদ সতেরো

নিষ্ঠুরতা এবং ক্ষমাশীলতা এবং ভীতির চেয়ে ভালোবাসা কি উত্তম

ইতিপূর্বে উল্লিখিত গুণাবলির সূত্র ধরে আমি বলতে চাই সকল শাসকেরই লক্ষ্য দয়ালু হওয়া, নির্দয় হওয়া নয়। সেই সঙ্গে তাঁকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না-হয়। সিজার বর্জিয়া নিষ্ঠুর হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিষ্ঠুর রোমাগনাকে তার রাজ্যের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করলেন; এবং এই প্রদেশে শৃঙ্খলা, শান্তি ও আনুগত্য ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর এই কার্যক্রমকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাস্তবিক পক্ষে তিনি ফ্লোরেনটাইনের জনগণের তুলনায় বেশি দয়ালু ছিলেন; কারণ তারা নিষ্ঠুরতা এড়াতে পিসটোয়াকে ধ্বংস হতে দিয়েছিল। প্রজাদের ঐক্যবদ্ধ এবং অনুগত রাখার প্রয়াসে কোনো শাসক নিষ্ঠুরতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে আপত্তি করবেন না। অন্তত তাদের চেয়ে তিনি বেশি ক্ষমতাবান যাঁরা অতিরিক্ত নরম হয়ে বিশৃঙ্খলাকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেন, যা থেকে সৃষ্টি হয় রক্তপাত এবং লুঠতরাজ। যা পুরো সমাজকেই কলুষিত করে। অন্যদিকে শাসকের নির্দেশে প্রাণদণ্ড নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বলা যায় একজন নতুন শাসকের পক্ষে নিষ্ঠুরতার দুর্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ নতুন রাজ্যে নানাদিক দিয়ে হাজারো বিপদ আসতে থাকে। নতুন রাজ্য বিবেচনা করে ডিডোর কঠোরতাকে মার্জনা করে ভার্জিল বলেছেন—একটি বিশৃঙ্খল রাজ্যের সন্দেহ নিরসনে কঠোর হতে হয়েছে নিজ রাজ্যের সীমানা বাঁচাতে।

একজন শাসক অবশ্যই তাঁর বিশ্বাস ও কাজে ধীরে এগোবেন। নিজের মনের ভয়ে খুব সহজেই বিপদাতঙ্কিত হবেন না। ধীরস্থিরভাবে সামনে এগোবেন। এগোবেন বিচক্ষণতা এবং মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তাঁকে অসাবধানী এবং অতিরিক্ত অবিশ্বাসী বা অসহিষ্ণু করে না তোলে। এর থেকে একটা প্রশ্ন ওঠে আসে ভীতির চেয়ে কি ভালোবাসার পাত্র হওয়া শ্রেয়, না কি ভালোবাসার চেয়ে ভীতির পাত্র হওয়া? স্বাভাবিক ভাবেই এর উত্তর আসে এই দুটোরই প্রত্যাশী হতে হবে। কিন্তু একই সময় এই দুটোর সহাবস্থান কষ্টকর। তখন দুটোর মধ্যে থেকে প্রশ্ন উঠলে ভালোবাসার চেয়ে ভীতির পাত্র হওয়াই উত্তম। মানুষ সম্বন্ধে সাধারণ

ধারণা যে, মানুষ অকৃতজ্ঞ, অস্থির, কপট, বিপদে পলায়নপর এবং কিছু পাওয়ার জন্য অত্যাগ্রহি। যতদিন আপনি তাদের সুযোগ দেবেন, ততোদিন তারা আপনার জন্য রক্ত দিতে পারবে। তারা আপনার জন্য রক্ত দিতে পারে, দিতে পারে বিত্ত-সম্পদ, জীবন এমনকি তাদের সন্তানদেরও; অবশ্য যতক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তা থাকবে যোজন দূরে। আর তা কাছে এগিয়ে এলে এরাই বিদ্রোহ করে বসবে। যে শাসক তাঁদের কথায় আস্থা রেখে নিজেকে রক্ষা করার বিকল্প কোনো পথ অবলম্বন করেননি, তাঁরা ধ্বংস হয়ে যাবেন। পুরস্কারের বিনিময়ে বন্ধুত্ব, যে বন্ধুত্বে থাকে না আত্মার মাহাত্ম এবং উদারতা, তা প্রত্যাশিত হলেও নিখাঁদ নয়। বিপর্যয়ের সময় এর উপর নির্ভর করা যায় না।

অন্যদিকে ভীতির মানুষের চেয়ে ভালোবাসার মানুষকে আঘাত করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কমই থাকে। ভালোবাসা থাকে নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু মানুষ স্বার্থপর। যে-কোনো স্বার্থের কারণে এই বন্ধন ছিঁড়ে যায় যে-কোনো মুহূর্তে। কিন্তু ভীতির পিছনে থাকে শাস্তির হাতছানি, তাই তা কখনো শেষ হয়ে যায় না। তাহলে একজন শাসক নিজেকে এমন ভীতির পাত্র করে তুলবেন না, ভালোবাসা অর্জন করতে না পারলেও যেন ঘৃণার পাত্র না হন। কারণ ভীতি এবং ঘৃণার অনুপস্থিতি একসঙ্গে চলতে পারে না। প্রজাদের ধনসম্পত্তি লুঠ না করলে এবং তাদের নারীদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পরিহার করলে শাসকের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব। কারও উপর যদি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হয়, তা দিতে হবে যৌক্তিকতার নিরিখে সুস্পষ্ট কারণের ভিত্তিতে। প্রজাসাধারণের ধনসম্পদ নেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ মানুষ তার পিতার মৃত্যুশোক যত সহজে ভুলতে পারে, পৈত্রিক সম্পত্তি হারানোর শোক তত সহজে ভুলতে পারে না। কোনো শাসক যদি একবার লুঠে অভ্যস্ত হয় তাহলে অন্যের সম্পত্তি লুঠ করার কারণ খুঁজে পাবেনই। পক্ষান্তরে জীবন নেয়ার কারণ খুঁজে পাওয়া তত সহজ নয়, এবং তা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। তবে যদি কোনো শাসক নিজেই তার সেনাবাহিনী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তাহলে সবার আগে তাঁকে নিষ্ঠুরতা অগ্রাহ্য করতে হবে। কারণ তা না-হলে সেনাদলকে ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং সার্থক সামরিক অভিযান পরিচালনা সম্ভব হবে না।

হ্যানিবলের অসংখ্য উল্লেখযোগ্য গুণের মধ্যে অন্যতম হলো নানা জাতির লোক নিয়ে বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। এই বাহিনীকে তিনি নিজে পরিচালনা করেছেন বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে। এই বিশাল বাহিনীর মধ্যে কখনো বিবাদ বাঁধেনি। সেনাপ্রধানের সঙ্গে কখনো মতানৈক্য হয়নি। ভালো কিংবা মন্দ উভয় সময় এমন অবস্থা বিরাজমান ছিল। এ সবই সম্ভব হয়েছিল তাঁর নির্দয়তার জন্য। এর সঙ্গে তাঁর অসীম সাহস তাঁকে সেনাদের কাছে সবসময় ভয়াবহ এবং শ্রদ্ধেয়

করে রাখত। তাঁর এই কঠিন কঠোরতার বাইরে আর কোনো গুণই তাঁকে এই প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি।

অবিবেচক লোকেরা একদিকে তার মহৎ কাজের প্রশংসা করেছেন, অন্যদিকে এই সার্থকতার মূল কারণটিকেই নিন্দা করেছেন। অন্য গুণগুলো যে যথেষ্ট কদরের হবে না তা বোঝা যাবে স্কিপিও-র দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে, যিনি কেবল তাঁর সময়ের নন বরং ইতিহাসে একজন উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন। স্পেনে তাঁরই সেনাবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এর কারণ আর কিছু নয় বরং তার দয়ার আধিক্য। যার ফলে তাঁর সেনাবাহিনী সুশৃঙ্খলিত ছিল না, যা ছিল তা কোনো সামরিক শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে না। বাস্তবতা হলো রোমান সিনেটে ফ্যাবিয়াস ম্যাক্সিমিনাস সিপিও-কে রোমের সেনাবাহিনী কলুষিত করার দায়ে দায়ী করেছেন। সহজ সরল প্রকৃতির জন্যে স্কিপিওর এক লেফটেন্যান্ট লকরিয়ান উপজাতিকে ধ্বংস করার পরও তার কর্মের জন্য কিংবা ঔদ্ধত্যের জন্য তাকে কোনো শাস্তি দেননি। একজন স্কিপিও-কে ক্ষমা করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে সিনেটে বলেছিলেন, এমন অনেক মানুষ আছে যারা ভালো করেই জানেন কীভাবে অপরকে সাজা না দিয়ে নিজের ত্রুটি পরিহার করা যায়, কোনো সম্রাটের অধীনে থেকে এমন দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিলে স্কিপিও-র খ্যাতি ও গৌরব ম্লান হয়ে যেত। কিন্তু রক্ষা পেয়েছেন সিনেটের সরকার থাকায়। তাঁর বিপজ্জনক ক্ষতিকর দিকটি কেবল গোপন থাকেনি বরং তাঁর গৌরবের কারণ হয়েছিল।

ভালোবাসা না ভীতি—কোনটি গ্রহণীয়? এমন প্রশ্নের উত্তরের উপসংহারে আমি বলব, মানুষ ভালোবাসে নিজের মুক্তচিন্তায় আর ভীত হয় শাসকের ইচ্ছায়। একজন বিচক্ষণ শাসক সবসময় নিজের ওপর নির্ভরশীল, অন্যের ওপর নয়। কিন্তু সর্বদা তাঁর চেষ্টা থাকবে ঘৃণার হাত থেকে রক্ষা পাবার—যা আমি আগেই বলেছি।

পরিচ্ছেদ আঠারো

শাসক কীভাবে আস্থাভাজন হবেন

সকলেই জানে, শঠতা এবং প্রবঞ্চনা নয় বরং সরল বিশ্বাস এবং সুকর্মই একজন শাসকের প্রশংসার মূল ভিত্তি। তবুও আমাদের কালের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যে সকল শাসক বড় কোনো কাজ করেছেন তাঁরা সরল বিশ্বাসকে খুব কমই গুরুত্ব দিয়েছেন; এবং চাতুর্যের সঙ্গে অন্যের ভাবনাকে বিভ্রান্ত করেছেন। যাদের আনুগত্য কেবলমাত্র সততা এবং সরল বিশ্বাস, তাদেরও জয় করেছেন। আপনাদের অবশ্যই জানতে হবে লড়াই করার দুটি পথ আছে—একটি আইনসম্মত ভাবে অন্যটি পেশিশক্তি বলে। প্রথমটি প্রয়োগ করে মানুষ আর অন্যটি করে পশু। আবার প্রথমটি যথেষ্ট নয় বলে বিবেচিত হলে দ্বিতীয়টির আশ্রয় নিতে হয় মানুষকেই।

একজন শাসককে তাই জানতে হবে কীভাবে মানুষের বিধান প্রয়োগ করা যায়, আবার কীভাবে পশুত্বকে প্রয়োগ করতে হয়। প্রাচীনকালের লেখকরা আলঙ্কারিকভাবে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। তাঁরা লিখেছেন কেমন করে এচিল্লেস এবং আরও অনেক শাসককে কল্পিত পৌরাণিক জীব চিরণের কাছে পাঠানো হতো প্রশিক্ষণ পেয়ে তার নিয়মানুবর্তিতায় গড়ে উঠতে। এই কল্পকাহিনী এই শিক্ষাই দেয় যে, তাঁদের গুরু একই সঙ্গে মানুষ এবং পশুর গঠনগুণ সমৃদ্ধ।

একজন শাসককে অবশ্যই জানতে হবে কেমন করে এই উভয় প্রবৃত্তিকে কাজে লাগাতে হয়; কারণ একটি ছাড়া অন্যটি কোনো স্থায়ী ফল দিতে পারে না।

কীভাবে পশুপ্রবৃত্তিকে কাজে লাগানো যায় তা জানা একজন শাসকের জন্য জরুরি। তাঁকে জানতে হবে কীভাবে শৃগাল এবং সিংহের প্রকৃতিকে ব্যবহার করা যায়। কারণ সিংহ ফাঁদের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না; আর শৃগাল পারে না নেকড়ের থাবা থেকে নিজেকে বাঁচাতে। একজন শাসককে শৃগাল হতে হবে ফাঁদ এবং জালগুলোকে জানতে; আবার সিংহ হতে হবে নেকড়েদের সন্ত্রস্ত করার জন্য। যিনি কেবল সিংহের চরিত্র বুঝতে চাইবেন তিনি তাঁর কাজটাই বুঝবেন না। একজন বিচক্ষণ শাসক তাঁর নিজের স্বার্থের বাইরে কোনো অঙ্গীকার করতে পারেন না, করবেন না। ফলে তাঁর বাধ্যবাধকতার কোনো কারণ থাকবে না। যদি সকল মানুষ ভালো হতো তাহলে এ হতো একটি মন্দ পরামর্শ। কিন্তু মানুষ যেহেতু

স্বাভাবিকভাবে খারাপ এবং কখনই আপনার প্রতি বিশ্বাসভাজন হবে না, তাই আপনি সেভাবেই তাদের সঙ্গে আচরণ করবেন। কারণ আপনার কাছে তাদের কোনো দায় নেই। কোনো শাসকেরই আইনত কোনো কারণ নেই যার জন্য বিশ্বাসের অভাবকে রঞ্জিত করে দেখতে হবে। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য আধুনিক উদাহরণ দেয়া যায়। দেখানো যায় শাসকের বিশ্বাসহীনতার কারণে কত শান্তিচুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি বাতিল হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তারাই সার্থক হয়েছেন যারা শৃগালের পথ অনুসরণ করেছেন।

কিন্তু একজন শাসকের নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গোপন করার কৌশল জানা জরুরি। জানতে হবে কীভাবে ধান্ধাল এবং কপট হওয়া যায়। কারণ মানুষ সরল প্রকৃতির এবং বর্তমান প্রয়োজন নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত থাকে যে, প্রতারকরা দেখে, তারা কম প্রতারিত হচ্ছে না। আমি অতি সাম্প্রতিক কালের একটি উদাহরণ তুলে ধরব। ষষ্ঠ আলেকজান্ডার প্রতারণা করা ছাড়া আর কোনো কাজ করেননি বা ভাবেননি। আর সব সময়ই এর পক্ষে কোনো না কোনো যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। পোপ আলেকজান্ডারের মতো দক্ষ ঘোষণায় পটু, বলিষ্ঠকণ্ঠে প্রতিশ্রুতিশীল এবং এর সামান্যই বাস্তবায়ন করার মতো শাসক আর দেখা যায় না। কারণ এই বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের দুর্বলতাটা তাঁর জানা ছিল।

উপরে উল্লিখিত সকল গুণই একজন শাসকের থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে এটা জরুরি যে বিষয়গুলি তাঁর আয়ত্বে আছে, এমন ভান করতে হবে। আমি আরো দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, এগুলোকে অর্জন করা এবং প্রতিনিয়ত কাজে লাগানো বিপজ্জনক। কিন্তু এসবে তিনি যে পটু এমন ভাব দেখানো জরুরি। উদাহরণ হিসেবে বলতে চাই, একজন শাসক হবেন দয়ালু, বিশ্বাসী, মানবিক, ধার্মিক এবং আন্তরিক। এবং ব্যক্তিগতভাবেও সেরকম হবেন। তবে তাঁর মনটা এমনভাবে তৈরি থাকবে যে, প্রয়োজনে যেকোনো মুহূর্তে তিনি বিপরীত পথে চলে যেতে পারেন। এবং এটা বুঝতে হবে যে একজন শাসক বিশেষ করে যিনি সম্প্রতি কোনো রাজ্যের শাসক হয়েছেন, তাঁর পক্ষে সকল বিষয় মেনে চলা সম্ভব নয়, যাতে মানুষ তাঁকে ভালো বলে অভিহিত করতে পারে। রাজ্য টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে মানবতা, দয়া এবং ধর্মের বিপরীত কাজ করতেও বাধ্য হবেন। সুতরাং তাঁর দোদুল্যমান মন থাকা জরুরি, যাতে বাতাস এবং ভাগ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত মত পরিবর্তন করতে পারেন। আর আগে যা বলেছি যদি সম্ভব হয় ভালো থেকে সরে না আসা, এবং প্রয়োজনে অশুভ কাজ করতে প্রস্তুত থাকা।

উপরে উল্লিখিত পাঁচটি গুণের বিপরীত কিছু হতে পারে এমন কোনো শব্দ উচ্চারণে একজন শাসক সদা সতর্ক থাকবেন। তাহলে মানুষ তাঁকে সর্বোতভাবে দানশীল

বিশ্বাসী এবং মানবতাবাদী বলে জানবে এবং শুনবে। জানবে ন্যায়পরায়ণ এবং দয়ালু বলে। অন্য সকল গুণের চেয়ে একজন শাসকের জন্য বেশি জরুরি হলো শেষ গুণটি রপ্ত করা। কারণ সবাই চোখে দেখে বিচার করে সে কেমন, খুব কম সংখ্যক মানুষ অনুভূতি নিয়ে বিচার করে। আর এই কম সংখ্যক বেশি সংখ্যকের মতামতকে উপেক্ষা করার সাহস করে না। কারণ সংখ্যাগুরুর পক্ষেই রাষ্ট্রশক্তি কাজ করে। আর মানুষের বিশেষ করে শাসকের কার্যাবলি বিচার করা হয় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে, যার উপর আপিল করার আর কেউ থাকে না।

রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থাপনায় সার্থকতাই তাই শাসকের দেখার মূল বিষয়। এক্ষেত্রে তিনি যে পথ অবলম্বন করবেন তা সবাই সম্মানজনকভাবে গ্রহণ করবে এবং প্রশংসনীয় বলে বিবেচিত হবে। কারণ সাধারণ মানুষ সবসময় বাহ্যিক চেহারা এবং ফলাফলকে গ্রহণ করে। আর অতি সাধারণ মানুষ নিয়েই পৃথিবী চলছে। খুব কম মানুষেরই অবস্থা ও অবস্থান আছে। এব্যাপারে সংখ্যাধিক্যদের করার কিছুই নেই। আমাদের সময়ের একজন শাসক (আরাগনের ফার্ডিন্যান্ড) যাঁর নাম উল্লেখ না করাই ভালো, যিনি শান্তি এবং সরল বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই প্রচার করেন না। কিন্তু তিনি যদি এর কোনো একটিকে গ্রহণ বা পালন করতেন তাহলে তার প্রতিদান হিসেবে তিনি খ্যাতি বা রাজ্য হারাতেন।

পরিচ্ছেদ উনিশ

শাসক অবশ্যই অবজ্ঞা এবং ঘৃণা এড়িয়ে চলবেন

একজন শাসকের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, সেগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখন সংক্ষেপে অন্যান্য গুণাবলির কথা বলব। আগেই বলা হয়েছে, যে সমস্ত বিষয় শাসককে ঘৃণার এবং অবজ্ঞার পাত্র করে তুলবে এমন সব কিছুকে এড়িয়ে চলতে হবে। যথাযথভাবে এমনটা করতে পারলে তিনি ঠিকমতো ভূমিকা পালন করেছেন বলে বলা যাবে। তাহলে অন্য দোষগুলো থেকেও বিপদের কোনো ভয় থাকবে না। সবার উপরে একজন শাসক লোভী হলেই ঘৃণিত হবেন। লোভী হতে পারেন প্রজাদের ধনসম্পত্তি এবং নারীদের লুঠ করে। এই সব কাজ থেকে তিনি অবশ্যই সচেতনভাবে দূরে থাকবেন। নিজের সম্পত্তি এবং সম্মানে হাত না পড়লে সাধারণভাবে ব্যাপক জনগণ শান্তিতে এবং পরিতৃপ্তির সঙ্গেই বসবাস করবে। স্বল্প কিছু মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রুখতে হবে, যা নানা ভাবে করা যায়।

তার কার্যকলাপে মানুষ যদি ভাবে তিনি স্থিরমতি নন, চপল, কামুক, দুর্বল ও অস্থির প্রকৃতির তাহলে তাঁর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। এগুলোর বিরুদ্ধে অটল পর্বতের মতো নিজেকে সংযত রাখতে হবে। নিজের কাজে এমন শৃঙ্খলা থাকবে যাতে লোকে তার সহনশীলতা, উদ্দীপনা, বীরত্বপূর্ণ মনোভাব এবং গাম্ভীর্য দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। প্রজাদের শাসনের বিষয়ে তাঁর আদেশ যেন প্রত্যাহারযোগ্য না-হয়। তিনি এমন অবস্থানে অটুট থাকবেন কেউ যাতে না ভাবে যে সে বঞ্চিত হচ্ছে বা প্রতারিত হচ্ছে। কোনো শাসক নিজের সম্বন্ধে এমন ধারণা সৃষ্টি করতে পারলে সত্যিই তিনি খ্যাতিমান হবেন। এমন খ্যাতিমান শাসকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা তাকে আক্রমণ করা কল্পনাতীত। কারণ তিনি নিজেই যোগ্য। প্রজাসাধারণ তাঁকে সম্মান করে। এসব সত্ত্বেও দুটি দিক দিয়ে শাসকের ভয় থাকে; এক. নিজের প্রজাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া; দুই. কোনো শক্তিশালী বিদেশী শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। ভালো সেনাবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর সাহায্যে দ্বিতীয়টি থেকে তিনি সহজেই রক্ষা পেতে পারেন। এবং এর যে-কোনো একটি থাকলে আর একটির অভাব হবে না। যতক্ষণ তাঁর বাইরের বিষয়টি শান্ত থাকবে ততক্ষণ অভ্যন্তরীণ শান্তি বিঘ্নিত হবে না যদি

না পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র কাজ করে। বিদেশী শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলেও তাঁর যদি সুসংগঠিত সেনাবাহিনী থাকে এবং তাঁর যেভাবে থাকা উচিত তেমনি থাকেন তাহলে তিনি সবসময় এমন আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবেন (অবশ্য যদি তিনি নিজেই ভেঙে না পড়েন)। যে ভাবে আমরা স্পার্টার স্বৈরশাসক নাবিসের বেলায় দেখিয়েছি। বহিঃসীমায় শান্তি বিরাজ করলেও শাসক পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেন না কারণ প্রজারাও গোপন ষড়যন্ত্র করতে পারে। তিনি খুব সহজেই এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে পারেন এবং প্রজাসাধারণকে সন্তুষ্ট রেখে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। নিজে যাতে নিন্দিত এবং ঘৃণিত না হন সেদিকে সব সময় দৃষ্টি রাখতে হবে, আর তা-ই হবে মূল লক্ষ্য যা আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি। জনগণ কর্তৃক ঘৃণিত ও নিন্দিত না হওয়াই জনগণের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার অন্যতম উপায়। কারণ ষড়যন্ত্রকারীরা সব সময়ই যুক্তি দেখায় জনগণের কল্যাণেই রাজার বিদায় (মৃত্যু) অপরিহার্য। কিন্তু যখন তারা দেখবে জনগণ দুঃখ বা আঘাত দেবে, তাহলে ষড়যন্ত্রকারীরা আর বেশিদূর এগুবে না, কারণ ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে সীমাহীন বাধা।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, অসংখ্য ষড়যন্ত্রের কথা শোনা গেলেও তার খুব কমই সার্থকতার মুখ দেখেছে। যিনি ষড়যন্ত্র করবেন তিনি একা কিছু করতে পারবেন না, আর যাকে সহযোগী হিসেবে পাবেন তাকেও বিক্ষুব্ধ হতে হবে। কোনো বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির কাছে ষড়যন্ত্রের ইচ্ছা প্রকাশ করামাত্র সে ব্যক্তি খুশিই হবে। কারণ ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে সে যেকোনো সুবিধা পেতে পারে। এ কাজের মাধ্যমে কিছু হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ তার থাকবেই। সেই সঙ্গে বিপজ্জনক এবং অনিশ্চিত পরিকল্পনার ব্যাপারটাও তার মাথায় থাকবে। ফলে সে হবে বিরল অকৃত্রিম বন্ধু; আর সে বিশ্বস্ত হলে এবং বিশ্বাস ভঙ্গ না করলে শাসকের চরম লাভ।

বিষয়টি সংক্ষেপ করতে অল্পকথায় বলা যায়, ষড়যন্ত্রকারীর থাকে ভীতি, হিংসা, সন্দেহ এবং শাস্তির ভয়। এগুলো তাকে অস্থির করে তোলে। অন্যদিকে শাসকের থাকে সরকারের মহিমা, আইনকানুন, বন্ধু-বান্ধব, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাব্যবস্থা ইত্যাদি। এই সব বিষয়ের সঙ্গে জনগণের শুভেচ্ছা থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অসম্ভব ব্যাপার। একজন ষড়যন্ত্রকারী স্বাভাবিকভাবে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার আগে থেকে সন্ত্রস্ত থাকবে। আর যেখানে জনগণ তার প্রতি বৈরী থাকবে সেখানে অপরাধ সংঘটিত করার পরও তার মনে ভয় থেকেই যাবে। এর কারণ সে জানে যে, জনগণের কাছ থেকে সে প্রত্যাখ্যাত হবে। এ বিষয়ে অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। কিন্তু আমি কেবল একটি মাত্র উদাহরণ তুলে ধরব, যা আমাদের বাবাদের কালে ঘটেছিল। বর্তমানে মেস্‌সের আন্নিবলের পিতামহ বোলোগণার শাসক

মেস্‌সের আন্নিবলে বেনটিভোগলি ক্যানেসচির ষড়যন্ত্রে নিহত হয়েছিলেন। যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল তার পরিবারের একমাত্র সন্তান মেস্‌সের জিওভ্যান্নি তখন নিতান্তই শিশু। মেস্‌সের আন্নিবলের মৃত্যুর পর জনগণ জেগে উঠল এবং সকল ক্যানেসচিকে মেরে ফেলা হলো। এ ছিল সেসময়ে বোলোগনায় বেনটিভোগলির অসাধারণ জনপ্রিয়তার ফল। এ এত ব্যাপক ছিল যে মেস্‌সের আন্নিবলের মৃত্যুর পর বোলোগনায় তাঁর পরিবারের রাজ্য শাসনের উপযোগী কেউ অবশিষ্ট না থাকায় জনগণ খুঁজে বের করল ফ্লোরেন্স-এ একজন বেনটিভোগলি আছেন, যিনি তখন পর্যন্ত এক কামারের পুত্র বলেই পরিচিত। তাকেই ডেকে এনে রাজ্যের শাসকের আসনে বসানো হলো। মেস্‌সের জিওভ্যান্নি বড় হয়ে রাজ্য শাসনের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনিই শাসকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমি শেষ করতে চাই এভাবে যে, জনগণ সঙ্গে থাকলে ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে শাসকের উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। এদিকে লক্ষ্য রাখা যে-কোনো শাসকের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

আমাদের কালের সুসংগঠিত এবং সুশাসিত রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম হলো ফ্রান্স। এখানে এমন কিছু উন্নত প্রতিষ্ঠান আছে যা সম্রাটের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে সক্ষম। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সংসদ বা পার্লামেন্ট-এর ক্ষমতা। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা অভিজাতগোষ্ঠীর উচ্চাভিলাষ এবং ঔদ্ধত্যের বিষয়টি জানতেন বলেই তাদের মুখ বন্ধ করার দিকটি ভেবে রেখেছিলেন। অন্যদিকে অভিজাতশ্রেণির প্রতি ভয়ের কারণে সৃষ্ট জনগণের ঘৃণার বিষয়টিও তিনি জানতেন। উভয় দিক রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজার বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে জনগণের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য দেখিয়ে অভিজাতদের অখুশি করতে চাইলেন না; আবার অভিজাতদের খুশি করে জনগণকেও বিরূপ করতে চাইলেন না। এই উভয় পক্ষের মাঝখানে সমন্বয়কারী হিসেবে তিনি সংসদ প্রতিষ্ঠা করলেন। যা রাজার হস্তক্ষেপ ছাড়াই অভিজাতদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ দুর্বল মানুষদের কিছুটা আনুকূল্য দেখাতে পারে। রাজা এবং রাজ্য সুরক্ষার জন্য এর চেয়ে ভালো কোনো ব্যবস্থার কথা ভাবা যায় না।

এর মধ্য থেকে আমরা আর একটা উপসংহারে পৌঁছাতে পারি। সেটা হলো দায়িত্বের কাজগুলো রাজা অন্যের হাতে তুলে দিলেন আর আনুকূল্য বা দয়া প্রদর্শনের কাজগুলোই শুধু নিজের কাছে রাখলেন। পরিশেষে আমরা বলতে চাই, শাসক অবশ্যই অভিজাতকে সম্মান করবেন। সহযোগিতার চোখে দেখবেন, সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখবেন যাতে সাধারণ জনগণের কাছে নিন্দার পাত্র না হয়ে ওঠেন। কয়েকজন রোমান সম্রাটের জীবন-মৃত্যুর কাহিনী পর্যালোচনা করে অনেকে হয়তো আমার বক্তব্যে আপত্তি করবেন। তাঁরা বলবেন এইসব সম্রাটদের অনেকেই

গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেছেন এবং দৃঢ় চারিত্রিক বলিষ্ঠতাও দেখিয়েছে; অথচ তারাও সাম্রাজ্য হারিয়েছেন, নিহত হয়েছেন ষড়যন্ত্রকারী জনগণের হাতেই। আমি এই আপত্তির উত্তর দিতে চাই। প্রসঙ্গত আমি এদের কয়েকজন সম্রাটের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলতে চাই যে এঁদের পরিণতি আমার দেয়া দৃষ্টান্তের এবং কথার বাইরে কিছু নয়। আমি কিছু বিষয় বিবেচনায় নিতে চাই যা সেসময়ের ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দার্শনিক মার্কাস থেকে ম্যাক্সিমিনাস পর্যন্ত যাঁরা সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছেন আমি তাঁদের কথা বলব। তাঁরা হলেন মার্কাস, তাঁর পুত্র কমোডাস, পের্টিনাক্স জুলিয়ান, সেভেরাস, তাঁর পুত্র এন্টেনিনাস কারাসেল্লা, মারসিমাস, হেলিওগ্যাবালাস, আলেকজান্ডার এবং ম্যাক্সিমিনাস।

শুরুতেই আমি বলব, অন্যান্য শাসকদের যেখানে উচ্চাভিলাষ এবং সাধারণ মানুষের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়; সেখানে রোমান সম্রাটদের তৃতীয় ঝামেলার মোকাবেলা করতে হয়। তা হলো সেনাবাহিনীর নির্দয়তা ও ধনলিপ্সা। তা এত দুর্দমনীয় যে অনেককে ধ্বংস করে ছেড়েছে। কারণ একই সঙ্গে সেনাবাহিনী এবং জনগণকে সন্তুষ্ট রাখা দুষ্কর। জনগণ শান্তি প্রত্যাশী, তাই শান্তি প্রিয় শাসকই তাদের পছন্দ। অন্যদিকে সেনাদের পছন্দ জঙ্গিবাদী আচরণকারী নিষ্ঠুর নির্দয় লোভী শাসক। তারা চায় শাসক এই মনোভাব নিয়ে শাসন চালাবেন যাতে সেনাদের বেতন বৃদ্ধি হতে পারে এবং তাদের ধনলিপ্সা এবং নিষ্ঠুরতাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেন। এই কারণে যে সকল সম্রাট তাদের সহজাত স্বভাব কিংবা সঞ্চিত দক্ষতা নিয়ে একই সঙ্গে সেনানিবাস এবং জনগণকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেন না তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এভাবে সকল সম্রাট বিশেষ করে যারা সবে সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছেন তাঁরা নতুন হওয়ায় দুই বিপরীত প্রবণতাকে উপলব্ধি ও নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সেনাদের খুশি করার দিকেই বেশি গুরুত্ব দেন এবং জনগণের দুর্ভোগের দিকটা ভেবেই দেখেন না। এই পরিণতি তাঁদের জন্য অপরিহার্য, কারণ সাধারণভাবে শাসক কারোর দ্বারা নিন্দিত হবার দায় থেকে একেবারে মুক্ত থাকতে পারেন না। তাঁকে প্রথমে সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে সাধারণ জনগণের কাছে ঘৃণিত না হন। তাতে ব্যর্থ হলে তাঁকে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে যাতে ক্ষমতাবানদের দ্বারা নিন্দিত না হন। সেকারণে সদ্য অভিষিক্ত শাসকদের কিছু অসাধারণ আনুকূল্যের প্রয়োজন। তাই জনগণ নয়, বরং সেনা আনুকূল্যই তাঁর জন্য বিশেষ জরুরি। এই প্রবণতা কতটা কাজে লাগানো যায় তা নির্ভর করে এর সঙ্গে নিজের সুনাম কতটা অটুট রাখতে পারেন তার উপর। এই কারণেই মার্কাস, পের্টিনাক্স এবং আলেকজান্ডার তিনজনই বিনম্র ন্যায়পরায়ণ, সদয় ও নির্দয়তার প্রতি কঠোর। মানবিক এবং সদাসয় বদান্য হবার পরও এঁরা দুঃখজনক পরিণতি

ভোগ করেছিলেন। ব্যতিক্রম কেবল মার্কাস-এর বেলায়। তিনি সম্মানজনক ভাবেই বেঁচেছিলেন এবং সম্মান নিয়েই মৃত্যু বরণ করেছেন। একমাত্র তিনিই উত্তরাধিকার সূত্রে সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন; সেনাবাহিনী বা জনগণের আনুকূল্যে নয়। এছাড়া তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। যার ফলে তিনি সবার প্রিয় পাত্র ছিলেন। যতদিন বেঁচেছিলেন সবসময় তিনি সেনা এবং জনগণকে যথার্থ মূল্যায়ন করতেন। ফলে কখনো ঘৃণিত কিংবা নিন্দিত হননি। কিন্তু পের্টিনাক্স ক্ষমতায় বসেছিলেন সেনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কম্মোডাসের শাসনামলে বিশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্থ সেনাবাহিনী পের্টিনাক্স নির্দেশিত সৎ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে পারল না। ফলে সম্রাট তাদের ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠলেন। এই ঘৃণার সঙ্গে অবজ্ঞা যুক্ত হওয়ায় বৃদ্ধ সম্রাট তাঁর শাসনকালের শুরুতেই ধ্বংস হলেন এবং নিহত হলেন।

বলা যায় ভালো এবং মন্দ উভয়ের পরিণতিই হতে পারে ঘৃণা। সুতরাং (আমি যেভাবে বলেছি) একজন শাসক যিনি তাঁর রাজ্যে স্থিতি চান তিনি সব সময় ভালো করলে চলবে না, যখন ব্যাপক জনগণ, সেনাবাহিনী অথবা অভিজাতশ্রেণি এই ত্রিমুখী সমর্থন প্রয়োজন হয় এবং এদের কেউ যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তাহলেও এদের সন্তুষ্ট রাখাই শাসকের জন্য অবশ্য করণীয়। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর ভালো কাজগুলোও তাঁর বিপক্ষে যেতে পারে। এবার আলেকজান্ডারের বিষয়টি দেখা যাক। তিনি ছিলেন সৎ। অন্যান্য গুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চৌদ্দ বছরের শাসনে তিনি কখনো কাউকে যথাযথ বিচারের বাইরে মৃত্যুদণ্ড দেননি। পৌরুষহীন বলে বিশেষিত হওয়ায় এবং সব সময় নিজের মা দ্বারা নিজেকে শাসিত হতে দিয়েছেন বলে তিনি ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন। ফলে সেনাবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করে।

চরম বিপরীত দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে কম্মোডাস, সেভেরাস, এন্টেনিনাস, কারাসেল্লা এবং ম্যাক্সিমিনাস চরিত্র বৈশিষ্ট্যে সবাই নিষ্ঠুর এবং লোভাতুর। স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে খুশি রাখার জন্য সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালাতে দ্বিধা করেননি। তা সত্ত্বেও কেবল সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস ছাড়া আর সবাইকে করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। কিছু ব্যক্তিগত যোগ্যতাবলে সেভেরাস সেনাদলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে সুখেই রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু জনগণের ওপর পীড়ন চালাতে ভুল করেননি। তাঁর গুণাবলি সেনাদল ও জনগণের দ্বারা এমনভাবে প্রশংসিত হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষ কিছুটা হতবিহ্বল এবং বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন। আর সেনারা হলো খুশি এবং শ্রদ্ধাবনত। যা তাকে সম্মানজনক আসনে আসীন করেছিল।

সমসাময়িক সময়ে সেভেরাসের কাজকর্ম ছিল মহৎ। এবার আমি দেখাব কীভাবে তিনি একই সঙ্গে খেকশিয়াল এবং সিংহের মতো কাজ করতে পারতেন। এদের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই শাসককে অনুকরণ করতে হয় যা আমি আগেই দেখিয়েছি। সম্রাট জুলিয়ান-এর আলসেপনা সম্বন্ধে সেভেরাস জানতেন। স্লাভোনিয়ায় যে সেনাদের তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন তাদের বোঝালেন পের্টিন্যাক্স-এর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তাদের রোম যাওয়া প্রয়োজন। পের্টিন্যাক্স তার রাজকীয় বাহিনীর হাতে নিহত হন। এই অজুহাতে সম্রাটের কাছে নিজের মনের কথা প্রকাশ না করে সেনাবাহিনী নিয়ে রোম অভিযানে গেলেন। অভিযানের কথা জানাজানি হবার আগেই তিনি ইতালি পৌঁছলেন। তার আগমনে ভীত হয়ে সিনেট সেভেরাসকে সম্রাট হিসেবে নির্বাচন করল এবং জুলিয়ান নিহত হলেন।

সম্রাট হবার শুরুতেই এমনকি সমগ্র সাম্রাজ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে নেবার আগেই তিনি দুটি সমস্যার সম্মুখীন হলেন। একটি হলো এশিয়ায়। এখানে পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর প্রধান নাইগার নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করলেন। আর একটি হলো পশ্চিমে। এখানে আলবিনাস নিজেই সম্রাট হতে চাইলেন। একই সঙ্গে দুই দিকের শত্রু মোকাবেলা করা বিপজ্জনক ভেবে সেভেরাস আলবিনাসের প্রতি প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নাইগারকে আক্রমণ করলেন। এই প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তিনি আলবিনাসকে লিখলেন সিনেট কর্তৃক সম্রাট নির্বাচিত হওয়ায় তিনি তাঁর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে চান। সেই সঙ্গে তাঁকে সিজার সম্মানে ভূষিত করলেন। সিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে নিজের সহকর্মী হিসেবে গ্রহণ করলেন। আলবিনাস সরল বিশ্বাসে এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। নাইগারকে পরাজিত ও হত্যা করে পূর্বাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে সেভেরাস রোমে ফিরে এলেন। সিনেটে তিনি অভিযোগ করলেন আলবিনাস তাকে দেয়া সব সুবিধা এবং উপকারের কথা ভুলে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তাঁকে (সেভেরাস) হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। এর পরিণতি তাকে ভোগ করতেই হবে। ফলে সেভেরাস ফ্রান্স গিয়ে আলবিনাসের সাম্রাজ্য এবং জীবন দুটোই কেড়ে নিলেন।

সেভেরাসের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত হিংস্র সিংহ এবং ধূর্ত শৃগালের মিশ্রণ। তিনি সকলের কাছে ভয়ের ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন। সেনাবাহিনীর কাছেও তিনি ঘৃণিত নন। আরও বিস্ময়কর যে, নতুন শাসক হওয়া সত্ত্বেও অচিরেই বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট হতে পেরেছিলেন। তাঁর বিশাল খ্যাতি জনগণের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ফলে তাঁর লোলুপতা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সেভেরাসের পুত্র এন্টেনিনাস কারাসেল্লা ছিলেন ব্যতিক্রমী যোগ্যতা এবং গুণের অধিকারী। যা তাকে জনসাধারণের কাছে

প্রিয় এবং সেনাবাহিনীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। নিজে সামরিক বাহিনীর লোক হওয়ায় সকল প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। উপাদেয় খাদ্য আর বিলাশবহুল দ্রব্যের প্রতি তাঁর অবজ্ঞার ভাব তাঁকে সেনাদের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। এসবের পরেও তাঁর নিষ্ঠুরতা এবং হিংস্রতা ছিল অভাবনীয় ও অতুলনীয়। বিভিন্ন সময় রোমের বহু লোককে তিনি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। রোমের জনগণের একটা বড় অংশ এবং আলেকজান্দ্রিয়ার প্রায় সমস্ত মানুষের নিধনযজ্ঞের তিনিই হোতা। ফলে সারা পৃথিবীতে তিনি হলেন ঘৃণিত। তাঁর নিজের লোকদের কাছে তিনি এমন ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিলেন যে নিজস্ব সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতেই তাঁর প্রাণ দিতে হলো।

একজন দৃঢ় সঙ্কল্প শাসক এধরনের মৃত্যু সবসময় এড়াতে পারেন না। কারণ কোনো ব্যক্তি যিনি মৃত্যুকে অবজ্ঞা করেন তা অন্যের ওপর বর্তায়। কিন্তু এ ধরনের মানুষের সংখ্যা কম। শাসকদের পক্ষে এদের ভয় পাবার কিছু নেই। বরং তাঁদের সতর্ক থাকতে হবে যারা কাজ করে এবং যারা তাদের চারপাশে থেকে সেবা দেয় এদের কেউ যাতে মনোক্ষুণ্ন না-হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় কারাসেল্লা যেমন ভুল করেছিলেন। কেবল শত সৈনিকের ইউনিটের অধিনায়কের ভাইকে হত্যাই করেননি বরং অধিনায়ককেও তিনি সব সময় তটস্থ রাখতেন। অথচ তাকেই তার দেহরক্ষী রাখলেন। এ ছিল নিতান্তই হঠকারী। যা এন্টোনিনাস কারাসেল্লার জন্য করুণ পরিণতিই ডেকে আনল।

এবার আমরা কম্মোডাসের কথায় আসব। মার্কাস ওরিলিয়াসের পুত্র হিসেবে তিনি স্বচ্ছন্দে রাজ্য শাসন করতে পারতেন। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললে তিনি জনগণ ও সেনাবাহিনী উভয়কে সন্তুষ্ট রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রকৃতির মানুষ। তিনি জনগণের উপর নিপীড়ন চালিয়ে সেনাদের প্রতি পক্ষপাত দেখালেন; সেনাদের লম্পট করে তুললেন। অন্যদিকে নিজের মর্যাদার তোয়াক্কা না করে পেশাদার মল্লদের সঙ্গে কসরৎ লড়ে এবং শাসকের পক্ষে মর্যাদাহানিকর আরও নানারকম কাজ করে সেনাদের কাছে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠলেন। জনগণের কাছে ঘৃণার এবং সেনাদের কাছে অবজ্ঞার পাত্র হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হলেন।

এখন বাকি আছে কেবল ম্যাক্সিমিনাসের চরিত্র বর্ণন। তিনি ছিলেন যুদ্ধবাজ। আলেকজান্ডারের দুর্বলতায় বিরক্ত সেনাবাহিনী আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর ম্যাক্সিমিনাসকেই সম্রাটের আসনে বসালেন, যা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি। দুটি কারণে তিনি অবজ্ঞা এবং ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠলেন। একটি হলো তার পারিবারিক দুর্বলতা, তিনি ছিলেন থ্রেসের পশুপালক

(যা সকলেই জানত এবং সবাই তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখত)। দ্বিতীয়টি হলো সম্রাট নিযুক্তির পরও সিংহাসনে আরোহণ করতে বিলম্ব করেছিলেন। তিনি রোম এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শাসকদের মাধ্যমে প্রচণ্ড নৃশংসতা চালিয়ে নিষ্ঠুরতার কুখ্যাতি কুড়িয়েছিলেন। যা রোম এবং এর আশপাশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে সারা বিশ্বে তাঁর অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দানা বাঁধতে থাকে। প্রথম ষড়যন্ত্রের শুরু হয় আফ্রিকায়। এর পর সিনেটের ভেতর এবং রোমের সাধারণ জনগণের মধ্যে। সবশেষে সমগ্র ইতালিব্যাপী। তাঁর সেনাবাহিনী এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। আকুলেইয়া অবরোধ ও দখল দুঃসাধ্য কাজ। তারা সম্রাটের নির্দয়তায় ক্ষুব্ধ হয়। তা এত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে যে সকল ভয় পায়ে দলে তাঁকে হত্যা করা হলো।

হেলিওগ্যাবালমাস কিংবা ম্যাক্সিমিনাস কিংবা জুলিয়াসের কথা বলব না; কারণ অতি অল্প সময়েই তাদের পতন হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই আলোচনার উপসংহারে আমি বলব আমাদের একালের শাসকদের রাজ্যগুলোর সেনাবাহিনীকে অতিরিক্ত সন্তুষ্ট রাখায় তেমন অসুবিধা নেই। এদের জন্য রাজ্যের কিছু বিবেচনা থাকবে ঠিকই, তবে এ কারণে সাধারণের অসুবিধা কমই দেখা দেবে। রোমান সাম্রাজ্যের মতো এই সব শাসক বা প্রদেশগুলোর প্রশাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এমন সেনাবাহিনী নেই, যাকে আলাদা করা যায় না। সেকালে যদি জনগণের চেয়ে সেনাদের বেশি খুশি রাখার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তার মূল কারণ ছিল তাদের অসীম শক্তি। আর আজকের দিনে শাসকদের জনগণের প্রতি বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারণ এখন সেনাদের চেয়ে জনগণই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী। এক্ষেত্রে তুরস্ক এবং মিশরের মহান সুলতান ব্যতিক্রমধর্মী। কারণ তুরস্কাধিপতি সবসময়ই বারো হাজার পদাতিক এবং পনেরো হাজার অশ্বারোহী সেনা পরিবেষ্টিত থাকতেন। যার উপর সাম্রাজ্যের শক্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করত। এই বিশাল বাহিনীকে সবসময় নিজের সেবায় নিয়োজিত রাখতে সাধারণ মানুষের কল্যাণে সবরকম বিবেচনা তাকে বাদ দিতে হয়।

মিশরের সুলতানের ব্যাপারটিও একই রকম। তাঁর রাজ্য ছিল সম্পূর্ণভাবে সেনা নিয়ন্ত্রণে, যা তাঁকে সুবিধাই দিয়েছিল। অশ্রদ্ধার পাত্র হলেও সেনাদের সঙ্গে একাত্ম থাকার কারণে তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেননি। এখানে আমি বলতে চাই মিশরের সম্রাটের রাজ্য ছিল অন্যান্য রাজ্য থেকে আলাদা। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পোপ শাসিত রাজ্যের সঙ্গে মিল ছিল। বংশানুক্রমিক এবং নব্য অভিষিক্ত শাসক—এর কোনো দিকেই একে ফেলা যায় না। কারণ সুলতানের মৃত্যু হলে তাঁর ছেলেরা উত্তরাধিকার সূত্রে সুলতান হন না। কেবল যাঁদের ক্ষমতা

দেয়া আছে তাঁরাই সম্রাট নির্বাচন করবেন। সময়ের প্রয়োজনে এ যেন এক পবিত্র দায়িত্ব। তবে একে ঠিক নব্য শাসনব্যবস্থা বলা যাবে না। কারণ এর সামনে নব্য শাসকদের প্রতিবন্ধকতা নেই। সম্রাট নতুন হলেও রাষ্ট্র কাঠামো পুরনো। এবং এমনভাবে সংগঠিত যে নির্বাচিতরা যেন তাদের উত্তরাধিকার সূত্রেই সম্রাট।

আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে এসে আমি বলব যিনি আমার আগেকার যুক্তিগুলো সচেতনভাবে অনুধাবন করেছেন তিনি দেখেছেন উল্লিখিত শাসকদের পতন হয়েছে ঘৃণা কিংবা অবজ্ঞার ফলে। তিনি আরো দেখবেন যে, যেভাবেই শাসকরা চলুন না কেন কারুর বিদায় হয়েছে একভাবে আবার আর একজনের হয়েছে অন্যভাবে। এই উদাহরণ দিয়ে বলা যায় কারুর হয়েছে সুখী সমাপ্তি আবার কারো দুর্ভাগ্যজনক নিয়তি। পের্টিনাক্স এবং আলেকজান্ডার উভয়ে নতুন শাসক হওয়া সত্ত্বেও মার্কাসকে অনুকরণ করা নিস্ফল এবং বিপজ্জনক হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রের শাসক। একই করুণ পরিণতি হয়েছিল কারাসেল্লা কম্মোডাস এবং ম্যাক্সিমিনাসের ক্ষেত্রে। তাঁরা সেরেভাসকে অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার মতো যোগ্যতা তাদের ছিল না।

সুতরাং একজন নতুন বা নব্য শাসক ক্ষমতায় বসেই মার্কাস ওয়েলিয়াসের আচরণবিধি অনুকরণ করতে পারেন না। তার জন্য সেপ্টেমিয়াস সেভেরাস-কে অনুসরণ করারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেভেরাসের কাছ থেকে জানতে হবে কীভাবে রাজ্য অর্জন করা যায়; আর মার্কাসের কাছে শিক্ষা নিতে হবে রাজ্য রক্ষা করতে হলে কী প্রয়োজন। আর গৌরবময় পথই-বা কী; যা এখন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

পরিচ্ছেদ কুড়ি

শাসকদের তৈরি নগরদুর্গ ও অন্যান্য জিনিস কি প্রয়োজনীয় না ক্ষতিকর

রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে কোনো শাসক তার প্রজাদের নিরস্ত্র করেছেন, কোনো শাসক তার রাজ্যকে ছোটো ছোটো ভাগ করে নিয়েছেন। আবার কেউ নিজেদের মধ্যে শত্রুতার প্ররোচনা দিয়েছেন। কোনো শাসক তাঁদের শাসনের শুরুতে যাদের সন্দেহভাজন মনে করেছেন তাদের পক্ষে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। কোনো শাসক তৈরি করেছেন দুর্গ; আবার কেউ পূর্ব থেকে থাকা দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। কোনো রাজ্য সম্বন্ধে বিশদ জানা না থাকলে সুনির্দিষ্ট রায় দেয়া সম্ভব নয়। তবুও বিষয়গুলোকে আমি স্বাভাবিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে কিছু বলব।

কোনো নতুন শাসক প্রজাদের নিরস্ত্র করেছেন এমন শোনা যায় না। বরং নিরস্ত্র দেখলে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। তাদের হাতে অস্ত্র দেয়া মানে নিজের হাতে অস্ত্র থাকা। যারা সন্দেহভাজন ছিল তারা বিশ্বাসী হবে, বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরা তাদের আস্থা দৃঢ় করবে এবং অনুগামী হবে এই-ই ছিল প্রত্যাশা। এভাবে জনগণ তাঁর অংশ এবং সমর্থক হবে। যদিও রাজ্যের সকল প্রজাকে অস্ত্র দেয়া যায় না, তবুও যাদের অস্ত্র দিয়েছেন তাদের আরও কিছু সুবিধা দিয়ে নিরস্ত্র প্রজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছেন। আর যাদের অস্ত্র দিলেন তাদেরকে নিজের প্রতি অনুগত রেখেছেন। অন্যেরাও ভুল বুঝবে না। কারণ বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তরা নিশ্চয়ই বেশি যোগ্য এবং বিপদ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

কিন্তু যদি কোনো শাসক তাঁর প্রজাদের নিরস্ত্র করেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের মনে আঘাত দেবেন। ভাববে তাদের ওপর শাসকের আস্থা নেই; ভাববে তাদের কাপুরুষতা এবং বিশ্বাসহীনতার কারণেই তাদের নিরস্ত্র করা হয়েছের। ফলে এই প্রজারা শাসককে ঘৃণা করবে। এবং যেহেতু সেনাবাহিনী ছাড়া শাসকের চলে না, তখন তাকে ভাড়াটে সেনার সন্ধান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী অধ্যায় আমি আমার কথা বলেছি। এই ভাড়াটে বাহিনী মন্দ না-হলেও এরা শাসকের নিরাপত্তায় শক্তিশালী শত্রু এবং সন্দেহভাজন প্রজাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই আমি বলছি, নতুন শাসককে সবসময় নিজের রাজ্যে সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে যা ইতিহাসের পাতায় চোখ ফেরালেই দেখা যাবে।

যখন কোনো পুরাতন রাজ্যের সঙ্গে নতুন রাজ্য সংযুক্ত হবে; তখন পরামর্শ হলো

নতুন রাজ্যের প্রজাদের নিরস্ত্র করতে হবে। বাদ রাখতে হবে কেবল তাদের, যারা ঘোষণা দিয়ে শাসকের সমর্থন জানিয়েছে। আবার সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের দুর্বল এবং পৌরুষহীন করে রাখতে হবে। তাহলে তাঁর সেনাবাহিনী এমনভাবে সংগঠিত হবে যেন তারা সবাই নিজের প্রজা এবং মূল রাজ্যের অধিবাসী।

আমাদের পূর্বপুরুষ, যারা বিজ্ঞ বলেই স্বীকৃত, তাঁরা বলতেন, উপদলীয় চক্র দ্বারা পিস্টোইয়াকে এবং নগর দুর্গ নির্মাণ করে পিসাকে সংযত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে কোনো কোনো নগরীতে পার্টি বিভাজনকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। অতীতকালে ইতালিতে বিভিন্ন শাসকের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল বলে এমনটা করা কি যুক্তিযুক্ত ছিল? কিন্তু আমি মনে করি বর্তমানে এই পদ্ধতি অচল। আমার বিশ্বাস পার্টি বিভাজন কোনো সুফল বয়ে আনতে পারে না। অন্যদিকে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে বিভক্ত রাজ্য সহজেই দখল হয়ে যাবে। বরং অপেক্ষাকৃত দুর্বলরা আক্রমণকারীর পক্ষেই যোগ দেবে, ফলে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আমার বিশ্বাস এমন মনোভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ভেনিসীয়রা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা নগরগুলোতে গুয়েনায় এবং ঘিবেলিয়ায় উপদলগুলোকে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু তারা কখনই রক্তঘাতি অবস্থার সৃষ্টি করেনি। না করলেও তাদের মধ্যে পার্থক্যকে এমনভাবে উৎসাহ দিত যে তাদের ঝগড়াঝাঁটির জন্যে ভেনিসীয়দের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে। তবে এই পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাজে লাগেনি। কারণ ভেইলায় পরাজয়ের পর এদেরই একটি দল তাৎক্ষণিক সাহস দেখিয়ে ভেনেসীয়দের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে সমগ্র রাজ্যই দখল করে নেয়। এ ধরনের ঘটনা শাসকের দুর্বলতারই প্রমাণ। কারণ কোনো শক্তিশালী সরকার এরকম দলাদলি বা ভেদাভেদ বরদাস্ত করতে পারে না। শান্তির সময় এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলেও যুদ্ধকালীন সময়ে তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। শাসকদের শাসনের সকল প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতা স্বার্থকভাবে মোকাবেলা করতে পারলেই তিনি মহৎ শাসক। তাই সৌভাগ্য যদি কাউকে কখনো মহৎ করে তুলতে চায় (যাঁর বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যের চেয়ে আরও বেশি খ্যাতি অর্জনের প্রয়োজন) প্রতিপক্ষই তা করতে পারে, করতে পারে শত্রুকে পরাস্ত করার মাধ্যমে। এভাবে তিনি উপরে উঠে যেতে পারেন শত্রুদের দেয়া সিঁড়ি বেয়েই, অনেকে তাই মনে করেন, সুযোগ পেলে একজন বিজ্ঞ শাসক সুকৌশলে কিছু শত্রু সৃষ্টি করেন; যাতে সেই শত্রুদের পরাস্ত করে নিজের ভিতকে মজবুত করে তুলতে পারেন।

শাসক বিশেষ করে নতুন শাসক শুরুতে যাদের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন তাদের

চেয়ে সন্দেহভাজনদের (প্রথম দিকের) ভেতরেই গভীর আস্থা এবং আনুগত্য খুঁজে পেয়েছেন। এভাবে সিয়েনার শাসক প্যানডলফো পেকরুচ্চি যাদের প্রথমে সন্দেহভাজন হিসেবেই গণ্য করতেন তাদের সহযোগিতা নিয়েই শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। তবে একে কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে শাসক অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমি কেবল বলতে চাই কোনো শাসকের রাজত্বের শুরুতে শাসক যাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন এবং যারা ভেবেছে নির্বিঘ্নে বসবাস করতে শাসকের সমর্থন অপরিহার্য তারা সহজেই শাসকের আনুগত্য মেনে নেয়। তারা শাসককে যথাসাধ্য সহযোগিতা করে কারণ তারা চাইবে কাজের প্রতি তাদের যোগ্যতা এবং আন্তরিকতা শাসকের বিরূপ মনকে জয় করে পূর্ব বদনাম ঘোচাতে। আর এভাবেই শাসক তাদের কাছ থেকে বেশি সহযোগিতা পাবেন, যারা ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্যে থেকেও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে না, তাদের চেয়েও।

এ প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় আমি নতুন শাসকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যে শাসক রাজ্যের অধিবাসীদের সহযোগিতায় রাজ্য জয় করেছেন তাদের খতিয়ে দেখতে হবে এই সহযোগিতার উদ্দেশ্য কী? এটা যদি তাঁর প্রতি সহজাত এবং স্বতঃস্ফূর্ত না-হয়, যদি পূর্ববর্তী সরকারের প্রতি অসন্তুষ্টির কারণে হয়, তাহলে তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখা কষ্টসাধ্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ। তাদের চাহিদা মেটানো শাসকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। আমরা যদি অতীত এবং বর্তমানের নানা ঘটনা পর্যালোচনা করে এর কারণ বিশ্লেষণ করতে চাই, তাহলে আমরা দেখব পূর্বেকার রাজত্বকালে যারা শাসকের উপর সন্তুষ্ট ছিল তারা নতুন শাসকের প্রতি বিরক্তই থাকবে। আর যারা বিরূপ ছিল তাদের বন্ধুত্ব লাভ এবং সহযোগিতা প্রাপ্তি অনেক সহজ।

নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা এবং বহিঃশত্রুদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্য দুর্গ নির্মাণ করা একটা সাধারণ রীতি হতে পারে। আমি এই পদ্ধতিকে সমর্থন করি। কারণ প্রাচীনকাল থেকেই এই রীতির প্রচলন ছিল। আবার আমাদের কালেই আমরা দেখেছি রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে মেস্‌সের নিকোলো ভিটেলি সিট্টা ডি কাস্টেলোতে দুটি দুর্গ ধ্বংস করে দিয়েছেন। আরবিনোর ডিউক গুইডোব্যালডো নিজের রাজ্যে ফিরে এসে সকল দুর্গ সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তিনি এক সময় সিজার বর্জিয়া কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন দুর্গ ছাড়া দ্বিতীয়বার আর এই রাজ্য হারাতে হবে না। বেন্টিভালনি বোলেননিয়াতে ফিরে এসে একই কাজ করলেন। সুতরাং সময় বিশেষে দুর্গ প্রয়োজনীয় হতে পারে; আবার না-ও হতে পারে। একদিকে এগুলো উপকারে আসে আবার অন্যদিকে

ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রশ্নটি এভাবে আলোচনা করা যেতে পারে, যে শাসক বিদেশীদের চেয়ে নিজের দেশের জনগণকে বেশি ভয় পায় তাদের দুর্গ নির্মাণ করা প্রয়োজন। আর যারা নিজের দেশের জনগণের চেয়ে বিদেশীদের বেশি ভয় পায় তাদের দুর্গ না থাকলেও চলে। ফ্রানসেসকো স্ফোর্জা নির্মিত মিলানের দুর্গ স্ফোর্জার ঘরে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল যা রাজ্যে আর কেউ করতে পারেনি। একজন শাসকের জন্য জনগণের ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় দুর্গ। কারণ যদি কারো সুউচ্চ দুর্গ থাকে আর জনগণের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে ওই দুর্গ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। যখন দেশের মানুষ কোনো শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে তখন তাদের সাহায্য করার জন্য বিদেশী শক্তির অভাব হয় না।

আমরা আমাদের সময়ের একটি দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ টেনে দেখাবো দুর্গ কীভাবে শাসকের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আর এ ছিল ফোরলি কাউন্টেসের বেলায়। যখন তাঁর স্বামী কাউন্ট জিরোলামো নিহত হলেন তখন ফোরলি দুর্গে আশ্রয় নিয়েই জনগণের রোষ থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন। পরে মিলানের সাহায্য নিয়ে দেশ উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। সে সময় অবস্থাটা এমন ছিল যে-কোনো বিদেশী শক্তি জনগণের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দুর্গ তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি। সিজার বর্জিয়া তাকে আক্রমণ করলেন। বিক্ষুদ্ধ জনগণ তাদের সঙ্গে হাত মিলালো। ফলে ওই দুর্গ আর তাঁর কোনো কাজে লাগল না। বলা যায় ইট সুরকির দুর্গের চেয়ে জনগণের ভালোবাসার দুর্গ গড়ে তুলতে পারলে নিজেকে সুরক্ষা করতে পারতেন।

প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে যারা দুর্গ নির্মাণ করেন তাঁদের যেমন প্রশংসা করতে হয়, যারা করেন না তাঁদেরকেও তেমনি প্রশংসা করা যায়। নিন্দা করবো তাকে যিনি কোনো দুর্গের ওপর আস্থা রাখেননি, আর জনগণের ভালোবাসার ধার ধারেননি।

পরিচ্ছেদ একুশ

শাসক কীভাবে সুনাম অর্জন করবেন

বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ কিংবা শৌর্যের কোনো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কোনো শাসক উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেন না। আমাদের সামনে এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলেন আরাগনের ফার্ডিন্যান্ড এবং স্পেনের বর্তমান রাজা। তাঁকে বলা হতো নতুন রাজা। কারণ অত্যন্ত দুর্বল অবস্থান থেকে নিজের বল ও খ্যাতির বলে খ্রিস্টীয় জগতের রাজা হয়েছেন। তাঁর কার্যাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা ছিল মহত্বপূর্ণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসাধারণ। রাজত্বের শুরুতেই তিনি গ্রানাডা আক্রমণ করলেন, যা ছিল তার ভিত মজবুত করার প্রথম পদক্ষেপ। তিনি এই আক্রমণ পরিচালনা করেন ঢিলাঢালাভাবে এবং কোনো প্রতিপক্ষের আশঙ্কা না করেই। এই অভিযানে তিনি ক্যাসটিলের ব্যারণদের ব্যস্ত রাখলেন, যাতে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে না পারে। রাজার জারি করা কোনো আদেশের প্রতিও তারা মনোযোগ দেবার সুযোগ পেত না। এভাবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রধানদের ওপর তিনি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। গির্জা এবং জনগণের অর্থে তিনি সেনাবাহিনীকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এভাবে দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে তিনি নিজের প্রতিরক্ষা বুহ্যকে সুদৃঢ় করেছিলেন; যা পরবর্তী সময়ে তাঁকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। বৃহত্তর অভিযানে সামর্থ্য অর্জন করে, আর ধর্মের অজুহাতে তার ভাষায় শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়ে মুরদের সর্বস্ব লুঠ করে তাদের দেশ ছাড়া করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর চেয়ে নিষ্ঠুর এবং অসাধারণ দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে। এমনিভাবে ধর্মের আলখাল্লা পরে আফ্রিকা আক্রমণ করলেন, আক্রমণ করলেন ইতালি এবং সবশেষে ফ্রান্স। এভাবে তিনি বিশাল সব পরিকল্পনা করতে লাগলেন যাতে তার রাজ্যের প্রজাসাধারণ অনিশ্চিত ও বিস্মিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়; আর ভবিষ্যৎ ফলাফল পর্যবেক্ষণেই ব্যস্ত থাকে। কাজগুলো তিনি এত দ্রুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে করে চললেন যে, দেশের মানুষগুলো স্থির হয়ে বসতে কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করার সুযোগ বা সময় কোনো কিছু করে উঠতে পারেনি।

অভ্যন্তরীন প্রশাসনের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপনও একজন শাসকের জন্য বিশেষ জরুরি। যেমনটি ঘটেছিল মিলানের মেস্‌সের বেরনাবোর বেলায়। নাগরিক জীবনে

ব্যতিক্রমী কিছু করতে পারলে, তা যতো ভালো কিংবা মন্দই হোক না কেন, তা মানুষের মুখে মুখে থাকবে। এভাবে একজন শাসক অবশ্যই পৃথক এবং চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপনে প্রয়াসী হবেন। এছাড়াও একজন শাসক আরও খ্যাতিমান হতে পারেন যদি বিশ্বস্ত বন্ধু কিংবা প্রকৃত শত্রু চিহ্নিত করতে পারেন। এটি আরও পরিষ্কার হবে যখন কোনো ভালোমন্দের তোয়াক্কা না করে কারো পক্ষে বিপক্ষে নিজের অবস্থানকে নির্বিঘ্নে ঘোষণা করতে পারেন। একেবারে নিরপেক্ষ থাকার চেয়ে এমন ঘোষণা তাঁর কৃতিত্বেরই পরিচায়ক, আপনার দুই শক্তিশালী প্রতিবেশী যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে যে পক্ষ জিতবে তাকে ভয় করবেন, না জিতলে ভয় করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় নিজেকে সরাসরি কারোর পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। এটা না করলে বিজয়ী আপনার দিকে করুণার চোখে তাকাবে, আপনি বিপদগ্রস্ত হবেন। পরাজিত পক্ষ আপনাকে নিয়ে মজা করবে, হাসাহাসি করবে, কাউকেই আপনার পক্ষে পাবেন না। কারণ বিজয়ী শক্তি কোনো সন্দেহভাজনকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না, যাকে সে বিপদের সময় কাছে পায়নি। আর পরাজিত শক্তি আপনার নিষ্ক্রিয়তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না, কারণ বিপদের সময় আপনি তাঁর হয়ে অস্ত্র ধরেননি।

এটোলিয়ানস্‌দের দ্বারা প্রেরিত হয়ে এন্টিওকাস গ্রিস গিয়েছিলেন রোমানদের বিতাড়িত করতে। রোমানদের বন্ধু এচিয়ানদের কাছে তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন নিরেপক্ষ থাকার অনুরোধ জানিয়ে। অন্যদিকে রোমানরা অনুরোধ করেছেন তাদের পক্ষে অস্ত্র ধরার জন্য। শেষপর্যন্ত ব্যাপারটি এচিয়ানদের উচ্চসভায় উঠল। সেখানে এন্টিওকাসের দূত তাঁদের নিরপেক্ষ থাকার পক্ষে যুক্তি দেখালে রোমের প্রতিনিধি বলেন, যুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করাটা আপনার রাষ্ট্রের জন্য ভালো ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, বিষয়টা হবে একেবারেই উল্টো; যদি আপনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তাহলে আপনি হবেন কোনো খ্যাতি ছাড়াই বিজেতার অনুগ্রহের পুরষ্কার প্রাপ্ত।

এটা স্বাভাবিক যে, যিনি আপনার মিত্র নন তিনি আপনাকে নিরপেক্ষ দেখতেই চাইবেন। আর যিনি আপনার বন্ধু তিনি চাইবেন বিপদে তার হয়ে অস্ত্র ধরুন অস্থিরমতি শাসকরা বর্তমানের বিপদ এড়াতে নিরপেক্ষতার পথই অনুসরণ করেন। যার পরিণতিতে ক্রমে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যান। কিন্তু যদি কোনো শাসক দৃঢ়তার সঙ্গে কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহলে বিজয়ী, সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, আপনার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। এ ব্যাপারে চরমতম অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ দিতে কেউ অত অসৎ হবে না।

এছাড়াও জয়লাভের বিষয়টি কখনো বিজয়ীর প্রতি সব দিক দিয়ে ন্যায়নিষ্ঠ নাও

হতে পারে। কিন্তু আপনি যাকে সমর্থন করেছেন সে পরাজিত হলে আপনাকে সব সময় বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করবে। যখন সম্ভব হবে আপনাকে সহযোগিতা করবে। এভাবে সে যখন জয়ী হবে, ক্ষমতাশীল হবে, তখনো আপনি তার অংশিদার থাকবেন। দ্বিতীয়ত. দুই যুদ্ধরত প্রতিপক্ষের যেকারোর বিজয়ে আপনার যদি ভয়ের কিছু না থাকে, তাহলেও কারো পক্ষ অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ আপনার সাহায্যেই একজন আর একজনকে ধ্বংস করতে পারবে। তিনি বুদ্ধিমান হলে তাকে বাঁচাতেও পারতেন। যদিও তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছেন, তবুও তিনি আপনার আয়ত্তে থাকবেন। যেন আপনার সাহায্য ছাড়া তাঁর পক্ষে যুদ্ধজয় সম্ভবই ছিল না। আর এখানে এটা মনে রাখা জরুরি যে, একজন শাসকের পক্ষে তাঁর চেয়ে শক্তিশালী কাউকে আক্রমণ করা সচেতনভাবে পরিহার করা উচিত; যদি না পরিস্থিতি এমন আক্রমণ করতে তাকে বাধ্য করে। কারণ যদি প্রথম জন জয়লাভ করেন তাহলে আপনি তার করুণার পাত্র হয়েই থাকবেন। তবে একজন শাসক অবশ্যই অন্যের ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টির অধীনে থাকা এড়িয়ে চলবেন। ভেনেসীয়রা মিলানের ডিউকের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল; এই জোট তাঁরা না করলেও পারতেন। অথচ এই জোটই তাঁদের ধ্বংস ডেকে আনল। কিন্তু জোট বাঁধা যখন অপরিহার্য হয়ে ওঠে যেমনটি ঘটেছিল ফ্লোরেনটাইনদের বেলায়। স্পেন এবং পোপ জোট বেঁধে লোমবার্ডি আক্রমণ করলেন; তখন শাসক অবশ্যই শক্তির পক্ষে থাকবেন। কারণ আগেই বলা হয়েছে কোনো রাজ্যেরই ভাবা উচিত নয় যে, সব সময়ই সে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারবে। বরং তাঁকে ভাবতে হবে রাজ্যের সর্বত্র সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। কারণ রীতিটা এরকমই যে, কোনো পক্ষের কাছে উন্মুক্ত না-হলে সকল অসুবিধা থেকে মুক্ত থাকা যায় না। নানা ঝুঁকি এবং বিপদকে এড়িয়ে চলতে ভালোর জন্য কম মন্দকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

একজন শাসককে সবসময়ই ভালোর প্রতি ভালোবাসা দেখাতে হবে। যারা নানা শিল্পে দক্ষ তাদেরকে সম্মান করতে হবে। প্রজাদের নিজ নিজ পেশায় উৎসাহ দিতে হবে; তা ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষিকাজ কিংবা অন্য যেকোনো মানবিক কাজ হোক না কেন। কেউ যেন না ভাবে যে বিশেষ কোনো নীতি বা বিধি তার কাজের উন্নতিতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে; বা নতুন কোনো কর তার নতুন ব্যবসায় শুরু করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। বরং এসব কাজ যারা করবে তাদের পুরস্কৃত করতে হবে। পুরস্কৃত করতে হবে নগর ও রাজ্য উন্নয়নে যারা সহায়তা করবে তাদের। এসবের বাইরে বছরের কোনো একটা সময় আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে প্রজাদের উৎফুল্ল রাখতে হবে। নগরগুলো যেহেতু বিভিন্ন গোত্র কিংবা শ্রেণিতে

বিভক্ত সেজন্যে শাসককে এর সবগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। মাঝে মাঝে তাদের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে নিজের মহানুভবতা ও মানবতা দেখাতে হবে। তবে সবসময় তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। কোনো পরিবেশ পরিস্থিতিতেই এগুলোকে বিসর্জন দেয়া চলবে না।

পরিচ্ছেদ বাইশ

শাসকের মন্ত্রী প্রসঙ্গে

মন্ত্রী নির্বাচন শাসকের জন্য খুব কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। মন্ত্রী ভালো হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। শাসক নিজে বিচক্ষণ কিংবা অন্যরকম। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর চারপাশের লোকদের দেখে। এতে শাসকের যোগ্যতা সম্বন্ধেও প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। মন্ত্রী এবং সহকর্মীরা যদি যোগ্য এবং বিশ্বাসী হয় তাহলে শাসকও বিজ্ঞ বলে পরিচিত হবেন। কারণ তিনি তাদের (মন্ত্রীদের) যোগ্যতা নির্ণয় করতে এবং অনুগত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি যদি অন্যরকম হয় তাহলে শাসকের প্রতি ধারণাও পাল্টে যাবে। কারণ মন্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি ভুলই করে বসেছেন। সিয়েনার শাসক প্যানডোলফো পেটরুচ্চির মন্ত্রী হিসেবে মেস্‌সের এন্টনিও ডি ভেনাফ্রা-কে যারা চিনতেন তারা সবাই মেসসের এন্টনিওকে মন্ত্রী নির্বাচন করায় প্যানডোলফো-কে বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেই বিবেচনা করতেন।

বুদ্ধিবৃত্তি তিন প্রকার। প্রথম হলো নিজেই নিজের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা কোনো বিষয়কে অনুধাবণ করতে পারা। দ্বিতীয়ত, অন্যের কাজ দেখে শুনে কিছু অনুধাবন করা। আর তৃতীয় যারা নিজেরাও কিছু বোঝে না আবার অন্যের কথাও শোনে না। এর প্রথমটি উত্তম বা শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয়টি ভালো, আর তৃতীয়টি যাচ্ছে তা। তাহলে আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবো যে প্যানডোলফো প্রথম শ্রেণির না-হলেও দ্বিতীয় শ্রেণির নিশ্চয়ই। যে-কোনো কাজ বা কথার ভালোমন্দ বিচারের বিচক্ষণতা থাকলে একজন শাসক উচ্চ ধী-শক্তি সম্পন্ন না-হলেও তার মন্ত্রীর ভালোমন্দ বিচার করতে পারেন; এবং একজনের প্রশংসা ও অন্যজনের নিন্দা করতে পারেন। তাহলে একজন মন্ত্রীও শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না বরং আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তাঁর কাজ করবেন। একজন মন্ত্রীকে বিচার করার একটি যথার্থ পদ্ধতি আছে, যা নির্ভুল বলে স্বীকৃত। যদি দেখা যায় মন্ত্রী শাসকের চেয়ে নিজেকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন, নিজের স্বার্থের বাইরে রাষ্ট্র সম্পর্কে কিছু ভাবেন না; তাহলে শাসক নিশ্চিত হবেন যে এই মানুষটি কখনো যোগ্য মন্ত্রী হতে পারে না, এবং তাকে বিশ্বাস করা যায় না। কোনো মানুষের হাতে যদি দেশের শাসনভার ন্যস্ত থাকে, সে কিছুতে নিজের সম্বন্ধে ভাবতে পারেন না। তাঁর ভাবনা আবর্তিত হবে

শাসককে ঘিরে এবং রাজ্য শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, এমন কোনো বিষয় কিছুতে শাসকের নজরে আনবেন না।

অন্যদিকে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে শাসককেও মন্ত্রীর কথা ভাবতে হবে। মন্ত্রীর প্রতি সদয় হয়ে তাকে সম্মানীত ও সম্পদশালী করতে হবে। মন্ত্রীর প্রতি দয়া দেখিয়ে, সৌজন্য প্রকাশ করে তাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে হবে। যাতে তাকে দেয়া সম্মান এবং সম্পদের প্রেক্ষিতে নতুন কিছুর প্রত্যাশা তার মনে না জাগে। শাসক এবং মন্ত্রীর মধ্যে এমন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হতে পারেন। এর অন্যথা হলে উভয়ের জন্যেই ক্ষতিকর পরিণতি বয়ে আনবে।

পরিচ্ছেদ তেইশ

চাটুকারদের কীভাবে এড়িয়ে চলতে হবে

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং দুষ্ট বিষয় যাকে মোকাবেলা করা শাসকের পক্ষে দুঃসাধ্য বটে, আবার তাকে বাদ দেয়াও যায় না। শাসক যদি বিচক্ষণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন না হন, এবং যথাযথভাবে মন্ত্রী মনোনয়ন করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি চাটুকারদের হাতে সহজেই ঘায়েল হতে পারেন। কারণ চাটুকারের অবস্থান ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানুষ সাধারণত তাদের নিজেদের কাজ নিয়ে এত সন্তুষ্ট ও ব্যস্ত থাকে এবং প্রত্যাশা এত ঊর্ধ্বমুখী যে সে কিছুতেই চাটুকারদের চাটুকারিতার বাইরে থাকতে পারেন না। একে এড়িয়ে চলতে এমন আচরণ করেন যে, নিজেই নিন্দিত হন। চাটুকারদের নিম্নমানের তোষামোদিদের প্রতিহত করার একমাত্র পথ হলো সত্য কথা বলায় কেউ বিব্রত হবে না এমন ধারণা দেয়া। অন্যদিকে সকলে যখন (আপনার কাছে) সত্য প্রকাশে নিঃসঙ্কোচ হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনি তাদের শ্রদ্ধা হারাবেন এবং সে ক্ষেত্রে একজন বিচক্ষণ শাসক মধ্যম পথ অবলম্বন করবেন। মন্ত্রী হিসেবে কেবল যোগ্য লোকদেরই নির্বাচন করবেন এবং তাদের কাছে সত্য প্রকাশে দ্বিধাহীন থাকবেন। আর তাঁরা কেবল আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন; অন্য কিছু নয়। কিন্তু শাসক তাঁদের কাছে যেকোনো প্রশ্ন করবেন, তাঁদের মতামত শুনবেন—যার প্রতিফলন পড়বে তাঁর নিজের ওপর। এবং সব শেষে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তের ওপর। সকল উপদেষ্টাদের সঙ্গে এমন আচরণ করবেন যাতে সবাই ভাববে তিনি সোজাসাপ্টা কথা বলেন তাই সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য। অন্যভাবে বললে বলা যায়, চাটুকারদের দ্বারা বিপথগামী হবেন; না-হয় মতামতের ভিন্নতার কারণে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাবেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনগণের আস্থা হারাবেন।

এ প্রসঙ্গে আমি আধুনিক কালের একটি উদাহরণ পেশ করবো। বর্তমান শাসক ম্যাক্সিমিলিয়ানের অনুগত প্যাডরে লুকা সম্রাট সম্বন্ধে বলেছিল, তিনি কখনো কারো পরামর্শ শুনতেন না, কিংবা নিজে উদ্যোগ নিয়েও কিছু করতেন না। যা ছিল ইতিপূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতির ঠিক উল্টোটা। একজন নিরিবিলি মানুষ হিসেবে তাঁর উদ্দেশ্য কাউকে বলতেন না আবার কারো পরামর্শও গ্রহণ করতেন না। কিন্তু কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গেলে তা জানাজানি হয়ে যেতো। ফলে তাঁর

চারপাশের মানুষগুলো তাঁর কাজের সমালোচনা করলে তিনি প্রভাবিত হয়ে পরিকল্পনা থেকে সরে আসতেন। তিনি আজ যা করেন বা করতে চান; কালই সেখান থেকে সরে আসেন। কেউ বুঝতেই পারে না তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা কী? কোন্ কাজটা তিনি করতে চান। ফলে তাঁর চিন্তা-ভাবনার ওপর কোনোভাবে নির্ভর করা যায় না।

একজন শাসক অপরের পরামর্শ নেবেন যখন তিনি চাইবেন, অন্যদের ইচ্ছায় নয়। উপযাচক হয়ে কেউ পরামর্শ দিতে গেলে তিনি অবশ্যই কঠোরভাবে বাধা দেবেন। তিনিই হবেন প্রশ্নকর্তা এবং সেইসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর শুনবেন ধৈর্য সহকারে। অন্যদিকে কেউ যদি কোনো কারণে সত্য গোপন করতে চায় তার প্রতি ক্ষুব্ধ হতে হবে।

যারা মনে করেন যে শাসকের খ্যাতির পেছনে তাঁর নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই বরং তাঁর চারপাশের উপদেষ্টাদের উপদেশের ফলেই তাঁর যত খ্যাতি তাহলে তাঁরা ভুল করবেন। কারণ এ এক স্বতঃসিদ্ধ রীতি যে, শাসক স্বাভাবিকভাবে প্রজ্ঞাবান নয়, তিনি কখনো ভালো উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন না, যদি না তিনি নিজেকে কোনো প্রজ্ঞাবান মানুষের হাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন। তিনি সব ব্যাপারে তাকে পথ দেখাবেন এবং তিনি হবেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন। এভাবে একজন শাসক সুনির্দেশিত হতে পারেন কিন্তু তা বেশি দিন স্থায়ী হবে না। কারণ তার উপদেষ্টারা এক সময় তাকে রাজ্য থেকেই বঞ্চিত করবে। আর যে শাসক নিজে বিচক্ষণ নন এবং একাধিক লোকের পরামর্শ গ্রহণ করেন—তাহলে তিনি কোনো একক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেন না। কারণ বিভিন্ন মতের সমন্বয় করে ঐকমত্যে পৌঁছানোর যোগ্যতা বা ক্ষমতা তাঁর নেই। তাঁর পরামর্শদাতারাও নিজ নিজ স্বার্থ দেখবেন; শাসক তাদের নিবৃত্ত করতে পারবেন না বা সংশোধনও করতে পারবেন না।

এর অন্যথা হতে পারে না। কারণ মানুষ সব সময়ই খারাপ বলে প্রতিপন্ন হবে, যদি না তাকে বাধ্য হয়ে ভালো হতে হয়। সুতরাং উপসংহারে আমাদের বলতে হয়, বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ যার কাছ থেকেই আসুক না কেন শাসকের বিচক্ষণতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবেই তা আসবে। শাসকের বিচক্ষণতা কখনো উপদেষ্টার উপদেশ থেকে আসবে না।

পরিচ্ছেদ চব্বিশ

ইতালির শাসকরা কীভাবে তাঁদের রাজ্য হারালেন

ইতিপূর্বে উল্লিখিত নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চললে একজন নতুন শাসকও প্রাচীন শাসকের মর্যাদা অর্জন করতে পারেন। পারেন পুরনো ঐতিহ্যের চেয়ে আরও দৃঢ় ও সুসংহত শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে। কারণ বংশানুক্রমিক শাসকের তুলনায় একজন নতুন শাসক মূল্যায়িত হন তাঁর কাজের মাধ্যমে। তাঁর কর্মকাণ্ড সদগুণমণ্ডিত বলে স্বীকৃত হলে ঐতিহ্যবাহী শাসকের চেয়ে তিনি আরও বেশি মানুষের মন জয় করতে পারেন। ফলে জনগণের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন আকর্ষণীয় এক ব্যক্তিত্ব। অতীত নয়, বর্তমান কর্মকাণ্ড দিয়েই মানুষকে মূল্যায়ন করা হয়। যদি তারা বর্তমানের মধ্যেই নিজের প্রত্যাশার সন্ধান পান, তাহলে তাঁরা তৃপ্ত হন এবং অন্য কিছু খুঁজতে চান না। অন্য কোনো ব্যাপারে অদক্ষতার পরিচয় না পেলে তারা সুশাসনকে রক্ষা করতে যেকোনো ত্যাগে পিছু হটেন না। এভাবে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তিনি দ্বিবিধ গৌরবের অধিকারী হবেন। উন্নত আইন-কানুন, সাহসী সেনাদল, উত্তম সহযোগী এবং প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁকে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করবে। আর ঠিক এভাবেই একজন দ্বিগুণ নিন্দিত হবেন, যদি নিজের অযোগ্যতার কারণে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাজ্য হারান।

আমাদের কালে যে সকল ইতালীয় রাজা রাজ্য হারিয়েছেন যেমন ন্যাপলস-এর রাজা মিলানের ডিউক এবং আরও অনেকে তাঁদের প্রসঙ্গ খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে তাঁদের সাধারণ ত্রুটি হলো দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। যে বিষয় আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা আরও দেখব অনেক ক্ষেত্রেই শাসকের কাছে জনগণ ছিল অপাঙক্তেও। প্রজাদের প্রতি সদাশয় মনোভাব থাকলেও তাঁরা অভিজাতদের মন জয় করতে পারেননি। এই সব ত্রুটি না থাকলে রাজ্য হাতছাড়া হয় না, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদল রাখার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে।

মেসিডনের ফিলিপ মহান আলেকজান্ডারের বাবা নন, যাকে টাইটাস কুইনটিয়াস পরাভূত করেছিলেন, তিনি রোম এবং গ্রিসের চেয়ে খুব বড় রাজ্যের অধিপতি ছিলেন না। তবুও সামরিক বিষয়াদি রপ্ত ছিল বলে এবং সেই সঙ্গে মানুষের মন জয় করার কৌশল এবং অভিজাতদের সমর্থন আদায় করার বিচক্ষণতা ছিল বলে তিনি রোম এবং গ্রিসের বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছেন। শেষ পর্যন্ত

কয়েকটি নগর হাত ছাড়া হলেও তাঁর রাজ্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন। আমাদের কালের শাসকদের মধ্যে যারা দীর্ঘদিন রাজত্ব করে রাজ্য হারিয়েছেন তাদের ভাগ্যের ওপর দায় চাপালে চলবে না; কারণ তাঁদের নিজেদের অবহেলা এবং ধৈর্যের অভাবেই তাঁদের এই পরিণতি। কারণ শান্তির সময় তাঁরা বিপরীত কিছু ভাবেন না। (এটা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি যে ভালো আবহাওয়ায় কখনো ঝড়ের কথা ভাবেন না।) তাই বিপদ এলে আত্মরক্ষার কথা না ভেবে পলায়নের কথাই ভাবতে হয়। ভাবেন, আক্রমণকারীদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রজাসাধারণই তাকে ফিরিয়ে আনবে। আর কোনো বিকল্প পথ না থাকলে এই ব্যবস্থাটা বেশ ভালো। কিন্তু নিজেকে ধ্বংস থেকে উদ্ধার করার জন্য অন্য উপায়গুলোকে অবহেলা করাও ঠিক নয়। কারণ কারুরই এমন বিশ্বাস থাকা উচিত নয় যে, সময়মতো কেউ না কেউ এসে পাশে দাঁড়াবে। সাধারণত এরকমটি ঘটে না; যদিও বা ঘটে তা শাসকের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। কারণ আত্মরক্ষার আত্মবল নয়, সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন অন্য কেউ। এক্ষেত্রে উত্তম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি কার্যকর, নিশ্চিত এবং স্থায়ী। যা তাঁর নিজের ইচ্ছা এবং সামর্থ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

পরিচ্ছেদ পঁচিশ

মানুষের জীবনে ভাগ্যের প্রভাব এবং প্রতিকারের উপায়

আমি জানি যে, অনেকে বিশ্বাস করেন পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে ভাগ্য এবং এক অসীম শক্তি (ঈশ্বর)। মানুষের মেধা এবং বিচক্ষণতা এতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। আসলে ভাগ্যদেবীর ঘোষণার বাইরে আমাদের কিছু করার নেই। তাই কোনো ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করে ভাগ্যের উপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের সময়ে মানুষের মনেও এই বিশ্বাস জন্মেছে। কারণ এই পৃথিবীতে যত বড় বড় পরিবর্তন ঘটে, যা প্রতিদিন আসে, তা মানুষের ভাবনার বাইরে।

বিষয়গুলোকে ভাবতে গেলে কখনো কখনো আমিও এর সঙ্গে কিছুটা জড়িয়ে পড়ি। তা সত্ত্বেও যখন আমাদের স্বাধীন চিন্তা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি তখন আমি মনে করি এটা হতে পারে যে, নিয়তি আমাদের কমবেশি অর্ধেক কাজ নির্ধারণ করে দেয়। আর বাকি অর্ধেক নির্ভর করে নিজেদের কর্মকাণ্ডের ওপর। একে আমি তুলনা করব বহমান নদীর সঙ্গে। নদী ক্ষেপে গেলে দুই পাড় প্লাবিত করে। গাছপালা ও বাড়িঘর চুরমার করে দেয়। আর এপারের মাটি ওপারে নিয়ে যায়। প্লাবনের আগে সবাই দৌড়ে পালায়, একে ঠেকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হলে এর উন্মত্ততার কাছে আত্মসমর্পন করে। এসব বিষয় জানা সত্ত্বেও নদী যখন শান্ত থাকে তখন মানুষ তাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো বাঁধ কিংবা বাধা তৈরি করতে উদ্যোগী হয় না, যাতে প্রমত্ত নদী ক্ষীণ হয়ে যায়। কিংবা এর প্রভাব দুর্বল হয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে না পারে কিংবা বিপজ্জনক কিছু না হয়ে ওঠে। ভাগ্যের ব্যাপারটাও ঠিক সেই রকম। সে জানে তাকে বাধা দেয়ার কোনো সুগঠিত উদ্যোগ নেই এবং আরও জানে তাকে বাধা দেয়ার মতো তাঁর সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।

এবার আপনি ইতালির কথা ভাবুন, দেশটি নানা পরিবর্তনের লীলাভূমি; ঘটন-অঘটনের কোনো শেষ নেই, দেখবেন এ যেন এক মুক্ত দেশ। এখানে কোনো বাঁধ বা পাড় নেই। জার্মান, ফ্রান্স এবং স্পেনের মতো যদি শৌর্য ও প্রতিপত্তি দ্বারা সুরক্ষিত করা যেত তাহলে প্লাবনের মতো এত বড় পরিবর্তন ঘটত না, কিংবা আদৌ কোনো পরিবর্তনই আসত না।

ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণভাবে এই কথাই যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রেখে আমি বলব; আমরা দেখি কোনো চরিত্রগত বা গুণগত পরিবর্তন ছাড়াই আজ যিনি ভাগ্যবান শাসক তিনি বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত। আমার বিশ্বাস ইতিপূর্বে আমরা যা আলোচনা করেছি তা থেকেই এমনটি ঘটে। যেমন, যে শাসক একেবারেই ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল, ভাগ্য পরিবর্তন হলে তার ধ্বংস অনিবার্য। আমি আরও বিশ্বাস করি, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে যার কাজ সম্পৃক্ত, তিনি ভাগ্যবান, আর সময়ের সঙ্গে যে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেন না তিনি ভাগ্যহীন। আমরা দেখি সকল মানুষই তার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পথ চলে। ব্যক্তি বিশেষে এই চলার পথ ভিন্ন। সম্মান এবং ঐশ্বর্য সকলের প্রত্যাশা। তা অর্জনে কেউ পথ চলেন সন্তর্পণে আবার কেউ উদ্দাম বেগে, কেউ চলেন দোর্দণ্ড প্রতাপে কেউ চতুরতার সঙ্গে। কেউ ধৈর্য সহকারে, কেউ দিশাহারা হয়ে। বিভিন্ন পথে চলে সবাই তাঁর মনজিলে পৌঁছে যান। আমরা আরও দেখি যে, দুই জন সমান বিচক্ষণ ব্যক্তি, একজন তার পরিকল্পনা মতো ঠিকই এগিয়ে যান, আর একজন পারেন না। আবার এ-ও দেখি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলেও দুইজনই সমান সার্থকতা অর্জন করেন—এর একজন বিচক্ষণ দূরদর্শী আর একজন অস্থির প্রকৃতির। অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য যা তাদের অনুসৃত পদ্ধতির সঙ্গে মিলতে পারে, আবার নাও মিলতে পারে। এর থেকে দেখা যায় আমি যেমন বলেছি যে, দুজন মানুষ যেমন ভিন্নভাবে কাজ করেও একই ফল অর্জন করে তেমনি দুজন একইভাবে কাজ করেও একজন তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছায়, আরেকজন পারে না। এই স্বার্থকতা অর্জনের পার্থক্যের কারণ হতে পারে যদি কোনো মানুষ সতর্কতার সঙ্গে ধৈর্য ধরে পথ চলেন, তাহলে সময় এবং পরিবেশও তার সঙ্গে থাকবে কিন্তু এর অন্যথা হলে কিংবা যদি পদ্ধতি পরিবর্তন করেন তাহলে তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। এমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ কমই আছে যারা সময় এবং পরিবেশের সঙ্গে সময়মতো নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। কারণ, হয় সে সহজাত স্বভাব থেকে সরে আসতে পারেন না কিংবা একই পথে পথ চলে বারবার উন্নতি করেছেন বলে নিজেকেই বুঝতে পারেন না। এখন সেই পথ থেকে সরে আসাই ভালো। আর তাই কোনো সচেতন মানুষের যখন সামনে আঘাত করার যথার্থ সময় উপস্থিত হয় তখন বুঝতে পারেন না কীভাবে আঘাত করতে হবে। তখন তিনি ব্যর্থ হন। অন্যদিকে তিনি যদি সময় এবং পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে না পারেন তাহলে ভাগ্য তাঁর প্রতিকূলেই থাকবে। পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস তাঁর সকল কার্য পরিচালনায় ছিলেন দ্রুতগতি সম্পন্ন। সময় আর পরিবেশের সঙ্গে তার কার্যক্রম সবসময় খাপ খাইয়ে নিতেন বলে তিনি সুফলও পেতেন সর্বদা। মেস্‌সের জিওভেন্নি বেন্টিভোগনি জীবিত অবস্থায় তাঁর

বোলোগনা অভিযানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ভেনেসিয়ানরা এতে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। স্পেন এবং ফ্রান্সের রাজারা অসন্তুষ্ট হয়ে এ ব্যাপারে আলোচনায় বসেছিলেন। তা-সত্ত্বেও নিজের দুর্দমনীয় মনোভাবের কারণে পোপ জুলিয়াস তাঁর অভিযান অব্যাহত রাখলেন। ফলে স্পেনিয়ান এবং ভেনেসিয়ানরা চুপ করে থাকতে বাধ্য হলেন। ভেনেসিয়ানরা থামলেন ভয়ে আর স্পেনিয়ানরা সমগ্র ন্যাপল্‌সকে পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে। অন্যদিকে পোপ ফ্রান্সের রাজাকে পক্ষে আনতে সক্ষম হলেন। জুলিয়াস অভিযান শুরু করায় এবং ভেনিসিয়ানদের দমন করে রাখার ইচ্ছায় তার বন্ধুত্ব প্রত্যাশী হয়ে সর্বোপরি নিজের কোনো ক্ষতি না-হয় এই কারণে রাজা তাঁর (পোপ জুলিয়াসের) আনুগত্য মেনে নিলেন।

দ্বিতীয় জুলিয়াস তাঁর দুর্দান্ত পদক্ষেপ দ্বারা যা অর্জন করলেন অন্য কোনো পোপ তাঁর সর্বোচ্চ বিচক্ষণতা দিয়েও তা পারতেন না। কারণ রোম ছাড়ার আগে যদি সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা এবং সকল খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন, যা যেকোনো পোপ করতেন, তাহলে তিনি সার্থক হতেন না। কারণ তাহলে রাজা হাজারো অজুহাত খুঁজতেন; আর হাজার হাজার আশঙ্কার কথা বলে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন। দ্বিতীয় জুলিয়াস এমনি আরও যত পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং যথারীতি সার্থকতা অর্জন করেছেন সেগুলো আর উল্লেখ করবো না। তাঁর স্বল্পদৈর্ঘ্য জীবন তাঁকে বিপরীত অভিজ্ঞতা থেকে রক্ষা করেছে। কেননা যদি এমনভাবে সময় আসত যে তিনি সতর্কভাবে এগোতে বাধ্য হয়েছেন তাহলে তিনি ব্যর্থ হতেন। কারণ যে স্বভাবে তিনি অভ্যস্ত সে পথ থেকে কখনো সরে আসতে পারতেন না।

তাই উপসংহারে আমি বলব, ভাগ্য পরিবর্তনশীল। মানুষ যতক্ষণ নিজের পথে অবিচল থাকে এবং যতক্ষণ তা ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে ততক্ষণ সফলতা আসবে। এর অন্যথা হলেই সে ব্যর্থ হবে। সামগ্রিক বিবেচনায় আমি বলতে চাই সাবধানী হওয়ার চেয়ে দুর্দান্ত হওয়া ভালো। কারণ ভাগ্য হলো স্ত্রীলোকের মতো। যদি তাকে বশে আনতে চাও তাহলে ঝাঁপিয়ে পড়ো এবং আঘাত করো। দেখবে সে শক্তিধর বলবানদেরকেই সহজে নিজের ওপর প্রভুত্ব করতে দেয়, দুর্বল এবং শান্তদেরকে নয়। সুতরাং নারী হিসেবে যুবকদেরই বেশি পছন্দ করে, বুড়োদের নয়। কারণ যুবকরা কম সাবধানী এবং বেশি হিংস্র; আর ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে অতিরিক্ত ধৃষ্টতা দিয়ে।

পরিচ্ছেদ ছাব্বিশ

বিদেশী বর্বরদের হাত থেকে ইতালিকে মুক্ত করার পরামর্শ

এ পর্যন্ত আমি যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করেছি তা বিশ্লেষণ করে এবং আমার নিজের ভাবনায় বর্তমান সময় কোনো নতুন শাসকের আগমন এবং তাঁকে সম্মানীত করার পক্ষে সুযোগ এনে দিয়েছে। একজন বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষকে সুযোগ এনে দিয়েছে ভিন্ন ধরনের সরকার গঠনের। যা তাকে সম্মানীত করবে এবং ইতালির সাধারণ মানুষের জন্যে শান্তির বার্তা বয়ে আনবে। নতুন শাসকের শাসনে এতগুলো বিষয়ের সমাহারের এখনই উপযুক্ত সময়। আমি কতদূর জানি, অতীতে আর কখনো পরিবর্তনের এমন সুযোগ আসেনি। আমি আগেই বলেছি মিশরে ইসরাইলি জনগণকে দাসত্বে বন্দি রাখতে মোসেসের ক্ষমতা দেখানো প্রয়োজন ছিল। বলেছি সাইরাসের সাহস এবং মহত্ত্বের ব্যাপকতা বোঝাতে মিডস্‌দের দ্বারা পারস্যের লোকদের নির্যাতিত হওয়া জরুরি ছিল। এছাড়া থেসিয়াসের সবচেয়ে ভালো অবস্থার দৃষ্টান্ত দেখাতে এথেনীয়দের ছত্রভঙ্গ হওয়াও প্রয়োজন ছিল। একইভাবে বর্তমান সময়ে একজন প্রতিভাধর ইতালিয়ানের ক্ষমতার স্বীকৃতির স্বার্থে ঐতিহাসিকভাবে ইতালি তার বর্তমান অবস্থায় নেমে আসবে। আবদ্ধ থাকবে হিব্রুদের চেয়েও কঠিন দাসত্বের শৃঙ্খলে। শৃঙ্খলিত হবে পারস্যের লোকদের চেয়েও কঠিন দাসত্বের বন্ধনে, অত্যাচারিত হবে পারস্যের লোকদের চেয়েও বেশি। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে এথেনীয়দের চেয়েও ব্যাপকভাবে; থাকবে শাসকহীন, শৃঙ্খলাহীন, পরাভূত, ছিন্নভিন্ন, বিধ্বস্ত এবং লুণ্ঠিত হয়ে। আর হতে হবে সবরকম ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি।

যদিও বর্তমান সময়ের পূর্ব পর্যন্ত একটা আশার আলো দেখা গিয়েছিল যে, স্বর্গ থেকে একজন নেমে এসে ইতালিকে পুনরুদ্ধার করবেন। তারপরও আমরা কী দেখলাম, তাঁর জীবনের পরিপূর্ণতার সময় তিনি এতটাই ভগ্যনির্ভর হলেন যে দুর্ভাগা প্রাণহীন ইতালি যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। তারপর অপেক্ষায় থাকা, হয়ত কেউ আসবেন যিনি ক্ষত সারিয়ে তার ধ্বংস ঠেকাতে পারবেন। প্রতিরোধ করবেন লামবার্ডির ধ্বংসযজ্ঞ। সক্ষম হবেন নেপ্লেস এবং তাসকেনির লোলুপদা ও বলপূর্বক কর আদায়ের প্রবণতা থামাতে। প্রতিহত এবং উদ্ধার করবেন

দীর্ঘসময়ের পচনশীল ক্ষত থেকে। দেখুন, কীভাবে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে, প্রার্থনা করছে এমন কাউকে প্রেরণ করতে যিনি বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতা থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারবেন। দেখুন, কী অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করছে নতুন এক পতাকার জন্য এবং সেই পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারে এমন একজনের জন্য। না হে মহৎ লরেঞ্জো, বর্তমানে আপনার ওই বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছাড়া বিশ্বাস রাখা যায় এমন আর কেউ নেই। এখন যিনি প্রধান আছেন, তাঁর যোগ্যতা এবং ভাগ্যক্রমে যদি ঈশ্বর এবং গীর্জার সমর্থন পান তাহলে তিনি কিছু কার্যকর পরিবর্তনের সূচনা করতে পারেন। আমি যার নাম উলে-খ করলাম, আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে তাঁর জীবনী এবং কর্মযজ্ঞ অধ্যয়ন করেন তাহলে দেখবেন আপনার জন্য এ খুব কঠিন কাজ নয়। বিরল এবং অনন্য হলেও এরাও মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁরা যে সুযোগ পেয়েছিলেন তা ছিল বর্তমানের চেয়ে অনেক কম। তাঁদের কাজও বর্তমানের চেয়ে সহজ এবং ন্যায্য ছিল না। ঈশ্বরও আপনার তুলনায় তাঁদের বেশি সহায়তা দেননি। তাহলে এখানেই আছে আসল ও ন্যায্য কারণ। প্রয়োজনে যুদ্ধই হবে প্রকৃষ্ট উপায়, আর অন্য কোনোকিছুর আশা না থাকলে অস্ত্রশস্ত্রের যথার্থ ব্যবহারের বিকল্প নেই। আপনার সামনে যে সকল উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো, তাদের অনুসরণ করলে আর সামনে যদি বিশেষ কোনো দুর্যোগ এসে না পড়ে তাহলে এই সুযোগ অবশ্যই আপনার পক্ষে থাকবে। তাছাড়া ঈশ্বরের কৃপায় কিছু অতুলনীয় বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। যেমন তাদের পথ চলতে সাগর ভাগ হয়েছে, নির্জন প্রান্তরে মেঘের নিশানা আপনাকে পথ দেখিয়েছে, তৃষ্ণা মেটাতে জলধারা নেমেছে পাহাড় থেকে, আর ক্ষুধা মেটাতে শস্যের বৃষ্টি ঝরেছে—আপনার উদ্দেশ্যে সব কিছুর সমন্বয় হয়েছে, এখন সুফল নির্ভর করে আপনার প্রচেষ্টার ওপর। ঈশ্বর সব কিছু করে দেবেন না। কারণ তাহলে আমাদের স্বাধীন চিন্তা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো, আর যা আমাদের গৌরবের অর্জন তারও ভাগিদার হবেন তিনি 'ঈশ্বর'।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, আমি যে সকল ইতালিয়ানের কথা উল্লেখ করেছি তাদের কেউ যা করতে পারেনি, আশা করি আপনার সামর্থ্যে আপনি তা করতে পারবেন। কারণ ইতালিতে সংগঠিত এত বিপ্লব এবং যুদ্ধ পরিচালনা—সর্বত্রই দেখা গেছে গোটা সামরিক শক্তিই যেন ক্ষীণবল হয় পড়েছে। এর মূল কারণ ইতালির পুরনোদিনের সামরিক ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। আর কেউ-ই এই ত্রুটিপূর্ণ পুরনো সামরিক ব্যবস্থা পরিবর্তের কোনো উদ্যোগ নেননি। নিজের সৃষ্ট নতুন আইন এবং সংগঠন একজন নতুন উঠে আসা মানুষকে যতটা সম্মানীত করে, অন্যকিছু তা করতে পারে না। এগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত হলে শাসক প্রশংসিত ও

সম্মানিত হন। ইতালিতে নতুন সংগঠন গড়ে তোলা কিংবা সংস্কারের সুযোগের কোনো অভাব নেই। নেতাদের মধ্যে না থাকলেও জনগণ অসীম সাহসের অধিকারী। কোনো কোনো দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও প্রতিযোগিতায় ইতালীয়রা শক্তি, ক্ষমতা ও বুদ্ধিমতায় উন্নততর বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সামরিক বাহিনী প্রসঙ্গে দেখুন এই শক্তি আর নেই। কারণ বাহিনী-প্রধানের অযোগ্যতা। এটা ঠিক যারা যুদ্ধবিদ্যায় সুদক্ষ তাদের কেউ এটা মানতে চায় না। আর সকলেরই ধারণা যে সে যথার্থই দক্ষ। বর্তমান কাল পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বশ্যতাস্বীকারে নিজের সাহস এবং সৌভাগ্য দিয়ে এত উঁচুতে কেউ ওঠতে পারেনি। এতদিনে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে। গত কুড়ি বছরে অনেকগুলো যুদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে কেবল ইতালিয় বাহিনী নিয়ে গঠিত সেনা পরিচালিত যুদ্ধে তাদের চরম দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই বলতে হয় টারোর কথা; এরপরে আসে আলেকজান্দ্রিয়া, কাপুরা, জেনোয়া, ভেইলা, বোলোগনা এবং মেসট্রির কথা।

তাহলে আপনার বিশিষ্ট সভাসদ যদি সেই সব প্রখ্যাত লোকেদের অনুসরণ করতে চায়, যাঁরা নিজের দেশ পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন, তাহলে সবার আগে প্রয়োজন নিজস্ব জাতীয় সেনাদল গঠন করা। ইতালিয়ান ছাড়া আর কোনো বিশ্বস্ত, যথার্থ এবং ভালো সেনাবাহিনী পাবেন না। যদি এরা সবাই ভালো হয়, ঐক্যবদ্ধ হলে তারা আরো ভালো হবে। আর যখন দেখবে যে নিজস্ব শাসকই তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, যে তাদের যথার্থ সম্মান এবং সহযোগিতা দেবে তখন তারা আরো তেজস্বী হয়ে উঠবে। তাহলে এটা নিশ্চিত যে, ইতালিয়ানদের নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজের দেশকে রক্ষা করতে নতুন ধরনের বাহিনী গঠনের বিকল্প নেই।

সুইস এবং স্প্যানিস পদাতিক বাহিনীর দুর্ধর্ষতা সবার জানা, তারপরও এই দুটির ত্রুটি আছে। যার ফলে একটি তৃতীয় বাহিনী কেবল তাদের বাধাই দেবে না তাদের পরাভূত করারও সাহস দেখাবে। কারণ স্পেনবাহিনী অশ্ববাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না। আর সুইসরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সমতুল্য পদাতিক বাহিনীকে ভয় পায়। তাহলে আমরা যা দেখেছি তার উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। স্পেনবাহিনী ফ্রান্সের অশ্ববাহিনীকে রুখতে পারে না; আর সুইচবাহিনী স্পেন পদাতিক বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। পরে উল্লিখিত বিষয়টির কোনো দৃষ্টান্ত এখনো দেখা না গেলেও আমরা রেভেন্নার যুদ্ধকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। যেখানে সেনাবাহিনী তাদের পূর্ণ কর্মতৎপরতায় ঢাল সজ্জিত হয়ে জার্মান দুর্গে ঢুকে পড়েছিল। জার্মানরা প্রতিহত করতে না পারলে তাঁরা নিরাপদেই জার্মান আক্রমণ করতে পারত। জার্মান অশ্বারোহী বাহিনী যদি

স্পেনবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে না পড়ত তাহলে তারা গোটা জার্মানকেই ধ্বংস করে দিত।

এই দুই প্রকার পদাতিক বাহিনীর দুর্বলতা মাথায় রেখে একটি নতুন বাহিনী গড়ে তোলা যেতে পারে। যেখানে এই ত্রুটিগুলো থাকবে না, এবং একই সঙ্গে পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীকে প্রতিরোধ করা যায়। কেবল অস্ত্রশস্ত্র পরিবর্তন নয়। বাহিনী গড়ে তুলতে হবে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নতুন নিয়ম-নীতির নিয়ন্ত্রণে। এটাই একমাত্র বিষয় যা সার্থকতার সঙ্গে করতে পারলে একজন নতুন শাসককে খ্যাতি ও মহত্ত্বের উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

সুতরাং দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর ইতালিতে একজন ত্রাণকর্তার আগমনের সুযোগ হাতছাড়া হতে দেয়া ঠিক হবে না। দীর্ঘকাল বিদেশী আক্রমণ-শোষণে পর্যুদস্ত প্রদেশগুলো প্রতিশোধের তৃষ্ণায়, বিশাল বিশ্বাসে, গভীর শ্রদ্ধায় এবং আনন্দাশ্রুতে কীভাবে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবে তা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই।

কোন দরজা তাঁর সামনে রুদ্ধ হবে? কুমিল্লা
কে তাঁর বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃতি জানাবে?
কোন শক্তি তাঁকে প্রতিহত করবে?
কোন ঈর্ষা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করবে?
কোন ইতালিবাসী সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁকে গ্রহণ করবে না?
ভিন্ দেশীদের এই বর্বর আধিপত্য সবার নাকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

সকল সত্য প্রতিষ্ঠা করার সাহস এবং গভীর প্রত্যয়ে আপনার স্বনামধন্য আশ্রয়স্থল যেন মুক্তির অন্বেষায় এগিয়ে আসে। তাহলে আপনার নেতৃত্বে আমাদের দেশ পুরনো ঐতিহ্য ফিরে পাবে। আর আপনার সুপ্রসন্ন ভাবনায় কবি পেত্রার্ক এর উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হবে—

সত্য-যুদ্ধ এগিয়ে যাক দুষ্ট ক্রূরতার বিরুদ্ধে
যুদ্ধই হটিয়ে দেবে অপশক্তির সকল ছোবল
ঐতিহ্যে নির্ভীক রোমানরা বেঁচে আছে আজও
নিঃশেষ হয়নি ইতালিবাসীর হৃদয়ের
সাহসের ধারা।

টীকাভাষ্য

আগাথোক্লেস Agathocles (খ্রিপূ ৩৬১-২৮৯)

খ্রিস্টপূর্ব ৩১৭ অব্দে আগাথোক্লেস নিজেকে সাইরাকাসের শাসক ঘোষণা করেন। ক্রমে তিনি সিসিলির অধিকাংশ এলাকা দখল করে নেন। বাকি থাকে কেবল কারথাস শাসিত অংশ। ৩১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হ্যান্ডিসকার পরিচালিত কারথাসিলিয়াচ সেনাবাহিনীর আক্রমণে গোটা সাইরাকাস অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তিনি যুদ্ধ করে আফ্রিকা পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু সাইরাকাসের বিভিন্ন নগরীতে বিদ্রোহ দেখা দিলে ফিরে আসতে বাধ্য হন এবং কারথাসের সঙ্গে সন্ধি করেন। ২৮৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রোমান ইতিহাসবিদ জাস্টিনের বিবরণ থেকে মেকিয়াভেলি তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।

আরাগোনের ফার্ডিনান্ড Ferdinand of Aragon (১৪৫২-১৫১৬ খ্রি)

পঞ্চদশ শতকে শক্তিশালী স্পেন গঠনের প্রধান ব্যক্তি। ক্যসটাইলের ইসাবেল্লাকে বিয়ে করে তিনি এই পথ সুগম করেন। ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি ইসাবেলার সাথে যৌথভাবে ক্যাসটাইলের শাসনকাজ পরিচালনা করেন। ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আরাগনের সম্রাট হন। ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের মূরদের দখলে থাকা সর্বশেষ রাজত্ব গ্রানাডা দখল করে নেন। তাঁর এককেন্দ্রীক শাসন পরিকল্পনা এবং বৈদেশিক নীতি ছিল ফ্রান্সকেন্দ্রীক। ন্যাপল্‌স বিভাজনের জন্যে ফ্রান্সের সঙ্গে তিনি চুক্তিবদ্ধ হন এবং ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে গোটা সাম্রাজ্য দখল করে নেন। তাঁর উত্তরাধিকার পৌত্র চার্লেস। যিনি সম্রাট পঞ্চম চার্লেস নামে খ্যাত ছিলেন।

আলবেরিগো কোনিও Alberigo Conio (১৩৪৪-১৪০৯ খ্রি)

রোমাগনার কুনিও প্রদেশের এক সম্মানীয় ব্যক্তি আলবেরিগো ডা বারবিয়ানো। ইতালিতে বিদেশী সেনাদের বিপুল বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে সবাই তাকে সমীহ করে চলতেন। পরে তিনি একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন, যেখানে কেবল ইতালিয়রাই স্থান পেত। ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান।

আলেকজান্ডার মহান Alexader, The great (খ্রিপূ ৩৫৬-৩২৩)

মহান আলেকজান্ডার বা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট বা তৃতীয় আলেকজান্ডার নামে সুপরিচিত মেসিডোনিয়ার সম্রাট। ৩৫৬ থেকে ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তিনি মেসিডোনিয়ার শাসক ছিলেন। ৩৫৬-তে সিংহাসনে আরোহন করেই তিনি রাজ্য বিস্তারে মন দেন। এক বছরের মধ্যে গ্রিস দখল করে নেন। পার্সিয়ার বিপক্ষে হেলেসপন্ট অতিক্রম করেন। ৩৩৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ডেরিয়াসকে পরাজিত করেন। এভাবে ক্রমে তিনি এশিয়ার প্রভু হয়ে বসেন এবং ৩২৭-এ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

আলেকজান্ডার এম Alexader M (২০৯-২৩৫ খ্রি)

পুরো নাম এরোলিয়াস আলেকজান্ডার সেভেরাস। ২২২ থেকে ২৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমের সম্রাট ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্রাট হেলিওগাবালাস-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি আলেকজান্ডারকে পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন ২২১ খ্রিস্টাব্দে। সম্ভবত ম্যাক্সিমিনিয়াসের নির্দেশে একদল বিদ্রোহীর হাতে তিনি প্রাণ হারান।

আলেকজান্ডার ষষ্ঠ Alexader VI (১৪৩১-১৫০৩ খ্রি)

কারডিনাল রোড্রিগো বর্জিয়া ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে পোপ নির্বাচিত হন। ব্যক্তিগতভাবে দুষ্ট চরিত্রের এবং উগ্র গোঁড়ামি ছিল তার সহজাত। অবৈধ সন্তানের প্রতি ছিল তার উগ্র স্নেহান্ধতা। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন যোগ্য শাসক। এই পোপ-শাসক ইতালিয় বাহিনীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। ফ্রাঙ্কো-স্প্যানিস যুদ্ধেও তিনি জড়িয়ে পড়েন। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

অ্যাসকানিও Ascanio

দেখুন কার্ডিনাল স্ফোর্জা।

ইপামিনোনডাস Epaminondas (খ্রিপূ ৪১৮-৩৬২)

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের থেবান জেনারেল এবং রাজনীতিবিদ। তিনি গ্রিস রাজ্যাধীন থেবসে দখল করে নেন। তিনি প্রাচীন গ্রিস থেকে থেবসে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

ইউরেলিয়াস এনটোলিয়াম মার্কাস Eurelious Antolium Markas (১২১-১৮৩ খ্রি)

১৬১ থেকে ১৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমান সম্রাট ছিলেন। তিনি ছিলেন 'স্টোইক' গোষ্ঠীভূক্ত। (স্টোইক' গ্রিক দর্শনের একটি আদর্শ, যারা সুখ-দুঃখে নির্বিকার) তাঁর শাসনকাল খ্রিস্টানদের জন্য দুঃসময়ের কাল বলে পরিচিত। উদার মানসিকতার এই দার্শনিক-শাসক শাসন কার্যে দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা দেখালেও নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন।

একুটো জিওভেন্নি Giovanni Acuto (১৩২০-১৩৯৪ খ্রি)

জন হাওকউড নামের ইতালি ভাষ্য। তিনি ফ্রান্সে কর্মরত ছিলেন এবং তৃতীয় এডওয়ার্ড তাঁকে নাইট উপাধীতে ভূষিত করেন। ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি ছোটো সেনাদল নিয়ে ইতালি যান। সেখানে তিনি একজন কনডোটিয়ার (Condottiere) হিসেবে স্থায়ী নাম অর্জন করেন। তাকে নিয়েই একটি ইতালিয় প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছিল বলে কথিত আছে। প্রবাদটি এরকম 'ইতালিয় হয়ে যাওয়া ইংরেজ জীবন্ত শয়তানের সমান'।

এচিলেস Achilles

মহাকবি হোমর রচিত 'ইলিয়াদ' মহাকাব্যের নায়ক। সেন্টাওর ফোয়েনিক্স এবং চিরণ এর কাছে বিদ্যার্জন করেন বলে ইলিয়াদে উল্লেখ আছে। সেন্টাওর কল্পিত পৌরাণিক জীব বিশেষ। এর উপরদিক মানুষের মতো আর নিচের দিক ঘোড়ার মতো। গ্রিক নৃসিংহের সঙ্গে তুলনীয়।

এন্টিওকাস Antiochus (খ্রিপূ ২৪২-১৮৭)

মহান (গ্রেট) এন্টিওকাস ছিলেন সিরিয়ার রাজা। খ্রিস্টপূর্ব ২২৩ থেকে ১৮৭ পর্যন্ত তিনি দেশ শাসন করেন। যার অধিকাংশ সময়ই তাকে রোমের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছে।

এন্টনিও ভেনাফ্রো Antonio Venafro

সিয়েনা-র প্যানডোফলো পেটরুচ্চিকে ক্ষমতা দখলে সহায়তা করেন। তিনি পেটরুচ্চির উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি ছিলেন। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে সেলিওনেতে উপস্থিত ছিলেন। সেসময় সিজার বর্জিয়ার অনুগতরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।

ওরসিনি Orsini

ত্রয়োদশ শতকে গড়ে ওঠা রোমের একটি প্রভাবশালী পরিবার। সিজার বোরজিয়া প্রথম দিকে এদের ভাড়াটিয়া কর্মী হিসেবে ব্যবহার করেন। ক্রমে সিজার-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে সিজার সিনিগাগলিয়ায় এদের সরিয়ে দেন।

ওলিভেরোটো ফার্মোর Oliverotto of Fermo (১৪৭৫-১৫০২ খ্রি)

নাম ওলিভেরোটো ইউফ্রেডুসি। ফার্মোর কার্যকলাপ সম্বন্ধে মেকিয়াভেলি মন্তব্য করেছেন, এ ছিল ১৫০১ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে সিনিগাগলিয়ায় তাঁকে গলাটিপে হত্যা করা হয়।

কম্মোডাস Commodus (১৬১-১৯২ খ্রি)

১৮০ থেকে ১৯২ খ্রিস্টাব্দে রোমের সম্রাট কম্মোডাস এন্টোনিনাস। কম্মোডাস তাঁর পিতা মার্কাস এউরেলিয়াস-এর উত্তরাধিকার হিসাবে সিংহাসন লাভ করেন। বাবা আর ছেলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কম্মোডাসের শাসনকাল নিষ্ঠুরতার কাল বলে খ্যাত। তাঁর গৃহকর্তী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যর পরামর্শে নার্সিসাস নামে এক মল্লযোদ্ধা তাকে গলা টিপে হত্যা করে।

কলোন্না Colonna

ত্রিশ শতকের রোমান অভিজাত পরিবারগুলোর অন্যতম এই পরিবার। ষষ্ঠ আলেকজান্ডার এই পরিবারের 'অভিজাত' সনদ বাতিল করে এর সকল বিষয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন।

কারম্যাগনোলা Carmagnola (১৩৯০-? খ্রি)

ফ্রানসেসকো বুসোনে কারম্যাগনোলা উপাধীধারী এই ব্যক্তি ১৩৯০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দে ভেনিচে তাকে চাকরিতে নিয়োগ করেন। এক সময় তিনি ভেনিচ এবং ফ্লোরেন্স-এর সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব পান। ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে সন্দেহভাজন হলে তাঁকে হত্যা করা হয়।

কারাসেল্লা Caracalla (১১৮-২১৭ খ্রি)

পুরো নাম এউরেলিয়াস এন্টনিনাস। রোমান সম্রাট সেভেরাস-এর পুত্র। বাবার মৃত্যুর পর ভাই গেটাকে নিয়ে সিংহাসনে বসেন। ২১২ খ্রিস্টাব্দে ভাই গেটাকে হত্যা করে নিজেই গেটা সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে বসেন এবং স্বৈরশাসন চালান। রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সকল মুক্ত নাগরিকদের অর্থের বিনিময়ে রোমান নাগরিকত্ব প্রদান করেন। ম্যাকরিনাসের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

কার্ডিনাল কোলোন্না Cardinal Colonna (১৪৭৯-১৫৩২ খ্রি)

স্যালেরনোর প্রিন্স এনটোনিও কোলোন্নার পুত্র। ষষ্ট আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে অষ্টম চার্লেসের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

কার্ডিনাল স্ফোর্জা Cardinal Sforza (১৪৫৫-১৫০৫ খ্রি)

এসকানিও মেরিয়া স্ফোর্জা নামেও পরিচিত। লুডোভিকো ইল মোরো-র ভাই। অষ্টম চার্লেস ইতালি দখলের উদ্যোগ নিলে পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডারের পক্ষ ত্যাগ করে কোলোনায় যোগদান করেন। অথচ ষষ্ঠ আলেকজান্ডারের পোপ নির্বাচনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কলোনা ছিল ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণাধীন। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে দ্বাদশ লুইস মিলান অধিকার করলে ফ্রান্স দখল করে নেন।

ক্যানেসচি Canneschi

বোলোগনা-র ক্ষমতাবান পরিবার। ভেনিস এবং ফ্লোরেন্স-এর বিপক্ষে মিলানের প্রভাবের সমর্থক ছিল এই পরিবার। ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই পরিবারের প্রধান ব্যক্তি প্রতিপক্ষ বেন্টিভোগলির কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। কিন্তু দেশের জনগণ তা প্রতিহত করে ক্যাননেসচি পরিবারকে দেশ ছাড়া করে।

গুইডোব্যালডো Guidobaldo, Duke of Urbino (১৪৭২-১৫০৮ খ্রি)

আর্বিনোর ডিউক এবং মনটিফেলট্রোর শেষ ডিউক। ১৪৮২ থেকে তিনি আর্বিনোর শাসক ছিলেন। সিজার বর্জিয়ার আগমনে ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশ থেকে পালিয়ে যান। সিজারের বিরুদ্ধে স্থানীয় সেনাবাহিনী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তিনি আবার দেশে ফিরে আসেন। ব্যাসডাসারের ক্যাসটিংলিয়ন-এর 'দ্য কোর্টিয়ার' গ্রন্থ তাঁর শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

গ্রাচি Gracchi

উল্লেখযোগ্য রোমান পরিবার। এই পরিবারের টিবেরিয়াস গ্রাচ্চু ১৩৩ খ্রিস্টাব্দে আততায়ীর হাতে নিহত হন। তিনি অভিজাততন্ত্রের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এর ফলেই তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। তার ভাই সেম্প্রোনিয়াস ব্রাচ্চু অভিজাতন্ত্রের সংশোধনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু সিনেটে তিনি প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। তবে তিনি জনগণের মন জয় করতে সমর্থ হন। এর পরে শুরু হয় দাঙ্গা। দাঙ্গার তার পক্ষের বহু লোক নিহত হন। শেষে তিনি নিজের ক্রীতদাসের হাতে প্রাণ হারান।

চার্লেস সপ্তম Charles VII (১৪০৩-১৪৬১ খ্রি)

ফ্রান্সের রাজা। তার রাজত্বকালে ইংরেজ অধিকৃত ফ্রান্স সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার হয়। তিনি অনেকগুলো আর্থিক ও সামাজিক সংস্কারের কৃতিত্বের দাবিদার। যা সাম্রাজ্যের ক্ষমতা দৃঢ় করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চার্লেস অষ্টম Charles VIII (১৪৭০-১৪৯৮ খ্রি)

ব্রিটানি-র রাজকন্যাকে বিয়ে করার এক বছরের মধ্যে ফ্রান্সের সার্থক শাসক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন (১৪৯১)। আনজউর উত্তরাধিকার হিসেবে ন্যাপল্‌সের সিংহাসনের দাবী করে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইতালি আক্রমণ করেন। পরের বছর তিনি ন্যাপল্‌সে প্রবেশ করেন। তাঁর নিরাপদ পশ্চাদাপসরণকে বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে স্পেন এবং ইতালির সম্রাট মিলে একটি সংঘ তৈরি করে। কিন্তু ফ্রান্সের চেয়ে ইতালি বাহিনী শক্তিশালী হওয়ায় যুদ্ধের পরিসমাপ্তির আগেই ফ্রান্স বাহিনী উত্তরে সরে আসতে বাধ্য হয়। ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বাহিনীকে ন্যাপল্‌স ছেড়ে

আসতে বাধ্য করা হয়। ন্যাপল্‌সে দ্বিতীয়বার আক্রমণের প্রস্তুতি নিতেই অষ্টম চার্লেস-এর মৃত্যু হয়।

জিওভ্যান্নি ফগলিয়ানি Giovanni Fogliani

তিনি ছিলেন ফেরমো নগরীর নামকরা নাগরিক। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিহত হন।

জিওভ্যান্নি বেন্টিভোগলি Giovanni Bentivogli (১৪৩৮-১৫০৮ খ্রি)

এন্নিবেলে বেন্টিভোগলির পুত্র। বাবা এন্নিবেলে ছিলেন বোলোগণার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হন। জিওভ্যান্নি ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে বোলোগণার শাসক ঘোষণা করেন। মিলানের পতনের পর ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে পুত্র এন্নিবেলেকে দ্বাদশ লুইসের কাছে পাঠান তার বশ্যতা স্বীকারের উদ্দেশ্যে। রোমাগনা শহরের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলে ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় লুইস তাঁকে দেশ থেকে বের করে দেন। ভিন দেশেই তাঁর মৃত্যু হয়। ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স বাহিনী নগর দখল করলে তাঁর ছেলেদের বোলোগণা আসার অনুমতি দেন। কিন্তু ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে বোলোগনা আবার দ্বিতীয় জুলিয়াসের অধিনে চলে যায়। এই ঘটনা মেকিয়াভলি *দ্য প্রিন্স*-এর উনবিংশ অধ্যায়ে ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

জুলিয়ানস ডিডিয়াস Didius Julians (১৩৩-১৯৩ খ্রি)

১৯৩ খ্রিস্টাব্দে রোমান শাসক পারর্টিন্যাস্ক নিহত হলে পারর্টিন্যাস্ক-এর দেহরক্ষী এবং মেজিস্ট্রেটরা জুলিয়ান ডিডিয়াসকে রোমান শাসক নির্বাচন করে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে রোমে সেভেরাসের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিহত হন।

জুলিয়াস দ্বিতীয় Julius II (১৪৪৩-১৫১৩ খ্রি)

পুরো নাম জিউলিয়ানো ডেল্লা রোভেরে। তিনি ছিলেন সান পিয়েট্রো এড্ ভিনকুলার পুরোহিত। ১৫০৩ থেকে ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ষষ্ঠ আলেকজান্ডারের পর তিনি কার্ডিনাল ফ্রানসেসকো পিকোলোমিনি-র স্থলাভিষিক্ত হয়ে কয়েক মাস তৃতীয় পিউসের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি সম্পন্ন গতিশীল সংগঠক ও সেনাধ্যক্ষ। তিনি গির্জাকেন্দ্রীক শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রোমান ব্যারনদের ক্ষমতা দুর্বল করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি রোম নগরির গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেন। সেন্ট পিটারের পুরনো রাজপ্রসাদ ভেঙে নতুন প্রসাদ নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই ভীতের উপরই বর্তমান সেন্ট পিটার্স নির্মিত।

জুলিয়াস সিজার Caesar Julius (খ্রিপূ ১০০-৪৪)

জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ১০০ অব্দে। মেকিয়াভেলির বর্ণনা অনুযায়ী তিনি জনগণকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হন। ক্রমে তিনি কঠিন স্বৈরাচারে পরিণত হন এবং ৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান।

জুলিয়াস ভেরাস ম্যক্সিমিনাস Maximinus Julius Verus (২১৭/২০-২৩৮ খ্রি)

ম্যক্সিমিনাস নামেই বিশেষ পরিচিত এই শাসক ২৩৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে ২৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমের সম্রাট ছিলেন। প্রথমে আলেকজান্ডার সেভেরাস তাঁকে উচ্চ সামরিক পদে বহাল করেন। পরে তিনি আলেকজান্ডারের স্থলাভিষিক্ত হন। আলেকজান্ডার সেভেরাস-এর হত্যাকারী বলে অনেকেই তাঁর দিকে আঙুল তোলেন। তাঁর স্বল্পকালীন শাসনকাল ছিল নিষ্ঠুরতা আর রক্তপাতের কাল। নিজের সেনা বাহিনীর হাতেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়।

জিরোলামো স্যাভোনারোলা Girolamo Savonarola (১৪৫২-১৪৯৮ খ্রি)

ফেরারায় জন্মগ্রহণ করে ফ্রিয়ার্স প্রিচার্স-এ চলে আসেন। জীবনের প্রথম দিকে শান্ত জীবন যাপন করেন। ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে আঠাশ বছর বয়সে তাঁকে ফ্লোরেন্সে সান মার্কো সাম্রাজ্যে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৪৯১-এর দিকে সান মার্কোসে তাঁর ধর্মপোদেশ, ভাববাদী এবং সমাজবিরোধী বক্তব্য তাঁকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। মেসিডির অপসারণের পর যখন তাঁর ভবিষ্যতবাণীই যথাযথ বলে প্রমাণিত হলো তখন রাজনীতির অঙ্গনে তাঁর প্রভাব বেড়ে যায়। ১৪৯৪ থেকে ১৪৯৭ পর্যন্ত তাঁর অবস্থান ছিল সবার উপরে। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত রিপাবলিকান সংবিধানের অধিকাংশই ছিল তাঁর সৃষ্টি। তিনি তিক্ত প্রতিকূলতারও সম্মুখীন হন। তাঁর অতিরিক্ত গোঁড়ামি, ধর্মতাত্ত্বিক বক্তব্য তাকে প্রতিকূলতার দিকে ঠেলে দেয়। তাঁর বক্তব্য যেন প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি বিশেষ করে গির্জার প্রতি আঘাত। গির্জার উৎসাহে আলেকজান্ডার তাঁর ধর্মপোদেশ প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। অবশেষে তাঁকে ধর্মালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ফ্লোরেন্সের মন্তব্যও তাঁর বিপক্ষে যায়। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিবাদের মুখে আলেকজান্ডার তাঁকে বন্দি করে শরীরিক নির্যাতন করেন। পরে তাঁকে হত্যা করা হয়।

জর্জেস ডি. এমবোইস Georges d'Amboise (১৪৬০-১৫১০ খ্রি)

রোউয়েন নামে বিশেষ পরিচিত। তিনি রোউয়েন (Rouen)-এর আর্চবিশপ ছিলেন ১৪৬০ থেকে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন দ্বাদশ লুইসের প্রভাবশালী উপদেষ্টা। বিশেষ করে ইতালি শাসনে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ষষ্ঠ আলেকজান্ডার ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে লুইসের সঙ্গে সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়।

জর্জিও স্কালি Giorgio Scali

ফ্লোরেনটাইনদের একটি গ্রুপের নেতা। ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে এক বন্ধুকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে বিচারকের এজলাসে হামলা চালান। শাস্তি হিসেবে তাঁর শিরোচ্ছেদ করা হয়।

টাইটাস কুইনটিয়াস Titus Quintius

ফ্লামিনিনাস টিটাস কুইনটিয়াস ১৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অন্যতম রোমান শাসক (consul) ছিলেন। মেসিডনের ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয়ী হন ১৯৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

ডিউক ফিলিপো Duke Filippo (১৩৯২-১৪৪৭ খ্রি)

পুরোনাম ফিলিপো মারিয়া ভিসকনটি। মিলানের ডিউকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ ডিউক। তার কন্যা বিয়ানকাকে ফ্রানসেসকো স্ফোর্জার সঙ্গে বিয়ে দেন। পাভিয়ার সাধারণ শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এই ডিউক। ১৪১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ভাই নিহত হলে উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি সম্রাট বা ডিউক হন। তার বাবা ছিলেন মিলানের নেতা জিয়ান গালেয়াজ্জো ভিসকন্টি (১৩৫১-১৪০২ খ্রি)

ডারিয়াস Darius (খ্রিপূ ৫৫০-৪৮৬)

ফরাসির শেষ রাজা। ৫২২ থেকে ৪৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তার রাজত্বকাল। মহান ডারিয়াস নামে পরিচিত। সাইরাসের পুত্র বার্জিয়া হত্যা করে তিনি জোরপূর্বক রাজ্য দখন করেন। দক্ষ শাসন ব্যবস্থা ও কর্মক্ষমতার জন্য তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ডেভিড David (খ্রিপূ ১০১২-৯৬২)

ইসরাইলের রাজা হিসেবে ইসরাইলের প্রথম রাজা সাউলের স্থলাভিষিক্ত হন। অনেকগুলো দুর্দান্ত যুদ্ধজয়ের ফলে রাজ্যের সীমানা বহু দূর বিস্তৃত করেন। জেরুজালেম অধিকার করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। সমগ্র ইসরাইলকে তিনি একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন।

থেসিয়াস Theseus (খ্রিপূ ১২৮৮-১২৩৪)

এথেন্সের রাজা এয়েগুসের পুত্র থেসিয়াস ছিলেন প্রবাদ তুল্য বীর। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে স্রেটান লেবাইরিথে সাইনোচারকে হত্যা করা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নাবিস Nabis

স্পার্টার স্বৈরশাসক নাবিস নৃশংসতার জন্য খ্যাত ছিলেন। ফিলোপোয়েমেল যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (১৯২ খ্রিস্টাব্দ)।

নিকোলো ওরসিনি Niccolo Orsini (১৪৪২-১৫১০ খ্রি)

পিটিগলিয়ানোর উল্লেখযোগ্য খেতাবধারী ব্যক্তি নিকোলো ওরসিনি। ভ্যানেটিয়ানস্‌দের চাকরি করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভ্যায়িলা যুদ্ধে যুগ্ম কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

নিকোলো ভিটেলি Niccolo Vitelli

সিট্টা ডি ক্যাসটেলোর শাসক ছিলেন। ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ চতুর্থ সিক্সটাস তাঁকে আক্রমণ করেন। কথিত আছে পোপ যে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন নিকোলো তা ধ্বংস করেন। ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে নিকোলো মারা যান।

পাইরহাস Pyrrhus (খ্রিপূ ৩১৮-২৭২)

ইরিপাসের সম্রাট। তিনি ম্যাসিডোনিয়া জয় করতে অভিযান চালান। ইতালির রোমান এবং সিসিলির ক্যারথাজিনিয়ানদের বিরুদ্ধে স্বার্থক যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

পাওলো ভিটেলি Paulo Vitelli

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পিজার আক্রমণের প্রাক্কালে ফ্লোরেন্স ভিটেলিকে চাকরিতে নিয়োগ করেন। ফ্লোরেন্স-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে গ্রেফতার হন। ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

পাওলো সিগনোর Signor Paulo

ওরসিনি গোত্রের প্রধান। সিনিগাগলিয়ায় সিজার বর্জিয়া কর্তৃক ওরসিনি পরিবার পরিত্যক্ত হবার পরও তিনি সিনিগাগলিয়ায় অবস্থান করেন।

পিয়্যারো ডি মেডেসি Piero de' Medici (১৪১৬-১৪৬৯)

পুরো নাম পিয়্যারো ডি কোসিমো ডি মেডেসি। তিনি ১ আগস্ট ১৪৬৪ থেকে ২ ডিসেম্বর ১৪৬৯ পর্যন্ত ফ্লোরেন্সের শাসক ছিলেন। তাঁর বাবা কোসিমো ডি মেডেসি ছিলেন প্রভাবশালী ধন্যাঢ্য ব্যক্তি। বিশ্বখ্যাত চিত্রকর্ম 'ম্যাডানা অব দ্য ম্যাগিনি ফিকেইট' তাঁদের পরিবারের সৃষ্টি।

রাজ্য শাসনকালে তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। দুষ্পপ্রাপ্য গ্রন্থের বিরাট সংগ্রহশালা ছিল পিয়্যারো ডি মেডেসির। ফুসফুসের জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। সান লরেঞ্জো চার্চে তাকে সমাহিত করা হয়।

মেকিয়াবেলি *দ্য প্রিন্স* গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে উৎসার্গিক লরেঞ্জোর বাবা পিয়্যারো ডি মেডেসির নাম উল্লেখ করেন।

পিয়্যারো সোডেরিনি Piero Soderini (১৪৫২-১৫২২ খ্রি)

মেকিয়াভেলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু পিয়্যারো সোডেরিনি। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে আজীবনের জন্য ফ্লোরেন্সের কলফালোনিয়ারি ডি জাস্টিজিয়া (Confaloniere di Justizia) নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেই তাঁর কার্যক্রম বিন্যস্ত ছিল। তিনি দৃঢ়ভাবে ফ্রান্সের নীতির সমর্থক ও অনুগামী ছিলেন। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে মেডেসি ফ্লোরেন্সে এলে তিনি ফ্লোরেন্স থেকে চলে যান।

পেত্রার্ক Petrarch (১৩০৪-১৩৭৪ খ্রি)

ফ্রানসেফকো পেত্রার্ক ছিলেন ইতালির প্রথম শ্রেণির কবিদের অন্যতম। পেত্রার্ক সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তক হিসেবে বিশ্ব সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত পথেই আধুনিক সনেটের বিকাশ। মেকিয়াভেলি তাঁর ঘনিষ্ঠব্যক্তি ছিলেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর কবিতার উপমা উপস্থাপন করতেন। বর্তমান *দ্য প্রিন্স* গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন তিনি পেত্রার্কের কবিতার চারটি ছত্র উদ্ধৃত করে। ইতালির শাসকের উদ্দেশ্য করে লেখা এই ছত্র চারটিতে যুদ্ধবিরোধী চেতনা ফুটে উঠেছে।

প্যানডোলফো ফেট্রাসি Pandolfo Fetrucci

সিয়েনার শাসক। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিয়েনার প্রভু হয়ে বসেন। ফ্লোরেন্সের সঙ্গে তাঁর সন্দেহজনক সম্পর্ক ছিল বলে অনুমান করা হয়। যাঁর সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য মেকিয়াভেলি কয়েকবার তাঁর কাছে যান বলে জানা যায়।

ফিলিপ মেসিডন Philip of Macedon

খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ তেকে ৩৩৬ এই চোদ্দ বছর মেসিডনের রাজা ছিলেন। প্রবল সম্প্রসারণবাদী ছিলেন তিনি। গ্রিসের বাকি অংশ দখল করে নেন। পারসিয়ার বিরুদ্ধে গ্রিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়ার প্রাক্কালে তিনি নিহত হন।

ফিলিপ মেসিডনের দ্বিতীয় Philip of Macedon II

২২০ থেকে ১৭৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মেসিডনের সম্রাট ছিলেন। রোমানদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। ১৯৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন।

ফিলোপোয়েমেন Philopoemen

এচায়িয়াল লিগের উল্লেখযোগ্য সেনাপতি। যিনি এচালিয়ানদের মর্যাদা রক্ষা করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের পথকে সুগম করার জন্য দক্ষ ও যোগ্য সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। ২০৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনিই প্রথম নির্বাচিত সেনাধ্যক্ষ।

ফেবিয়াস মেক্সিমাস Maximus Fabius (খ্রিপূ ২৮০-২০৩)

পর পর পাঁচ বার রোম সাম্রাজ্যের শাসক ফেবিয়াস মেক্সিমাস ২১৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্বৈরশাসকে পরিণত হন। সে সময়ে হান্নিবেল-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছিল। তিনি দুষ্ট কুটবুদ্ধির জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন স্কিপিও-র প্রতিদ্বন্দ্বি। ২০৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি মারা যান।

ফেরারার ডিউক Duke of Ferrara (১৫৩৩-১৫৯৭ খ্রি)

ফেরারার শাসক এরকোলো ডি এস্টেট ১৪৭১ থেকে ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ডিউকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর সৎ ভাই বোরসো ডি এস্টেট-এর স্থলাভিসিক্ত হয়। তিনি ছিলেন প্রথম ডিউক। অবশ্য ফেরারায় এই পরিবারের গোড়া পত্তন হয় ত্রিশ শতকের গোড়ার দিকে। তিনি ন্যাপল্‌সের রাজা যোরানটার মেয়েকে বিয়ে করেন। ভেনিচ-এর সঙ্গে অর্থনীতির বিরোধ এবং তাদের পৌরোহিত্যের দাবির প্রেক্ষিতে ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে ফেরানেট এবং এরকোলন-এর বিরুদ্ধে ভ্যানেনিয়ানস ও চতুর্থ সিক্সটাস-এর সঙ্গে তিনি সন্ধি করেন। এই যুদ্ধে বহু ইতালিয়ান অংশ গ্রহণ করে। সিক্সটাস সন্ধি ভেঙ্গে পক্ষ ত্যাগ করলে বহু এলাকা ফেরারার হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স মিলান দখল করলে তিনি ফ্রান্সের আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাদের আশ্রয় পান। ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্যামব্রে সংঘে যোগ দেন। তিনি দীর্ঘদিন ফ্রান্সের সুহৃদ ছিলেন। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফোরলির খেতাবধারিনী Countess of Forli (১৪৬৩-১৫০৯ খ্রি)

ফোরলির স্বনামধন্য ব্যক্তি সেটেরিনা স্ফোর্জা। জালেয়াজো স্ফোর্জা এবং লুক্রেজিয়া ল্যানড্রিয়ানির জারজ কন্যা। ফোরলির খ্যতিমান শাসক জিরোলামো রিয়ারিওকে বিয়ে করেন। ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামী নিহত হলে তিনি নিজেই ক্ষমতা দখল করেন। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে সিজার বর্জিয়া ফোরলি দখল করার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে রোমে বন্দি জীবন কাটান। ফ্রান্সের এক মঠে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফ্রানসেসকো স্ফোর্জা Francesco Sforza (১৪০১-১৪৬৬ খ্রি)

মিলানের ডিউক ফিলিপ্পো ডিসকটির চাকরিতে নিযুক্ত হন। ডিউকের জারজ কন্যা বিয়ানকা মারিয়াকে বিয়ে করেন। ভিসকটির মৃত্যুর পর ডিউকের জমিদারী দখল করে নেন (১৪৫০)। মিলানে তিনি সার্থকতার সঙ্গে শাসন পরিচালনা করেন। তাঁর পাঁচজন অনুসারী পর্যায়ক্রমে ডিউকের দায়িত্ব পান ও পালন করেন।

বারটোলোমিও বারগামো Bartolommeo Bergamo

পুরা নাম বারটোলোমিও কোলেওয়ান দ্য বারগামো। তিনি ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভেনিসে চাকরি করতেন। কারমাগনোলার পদচ্যুতির পর তিনি বিনিসীয় বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব পান। ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্যাগলিওনি Baglioni

পেরুগিয়ার পাপাল শহরের শাসক। পঞ্চদশ শতকে এখানে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়।

ব্রাসিও Braccio (১৩৬৮-১৪২২ খ্রি)

পুরো নাম আন্দ্রেয়া ব্রাসিও ডা মন্টনে ন্যাপল্‌স-এর জোয়ান্না বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি নিহত হন।

ভিটেলি Vitelli

রোমার রাজ্যে সিট্টা ডি ক্যাসটেলো-র একটি অভিজাত পরিবার।

ভিটেলোজো Vitelozzo

ভিটেলোজজো ভিটেলি ছিলেন একজন ভাড়াটে সেনাধ্যক্ষ। ভাই পাওলো ভিটেলি-র সঙ্গে ফ্লোরেন্স সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ভাই পাওলোর-ফাঁসি হলে তিনি রক্ষা পান। পরে সিজার বর্জিয়ার বাহিনিতে কাজ করেন। সেখানে ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়ার অপরাধে ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে সিনিসাগলিয়ায় তাকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়।

মার্কুয়েস (মানটুয়া) Marquis of Mantua (১৪৬৬-১৫১৯ খ্রি)

অন্যনাম ফ্রান্সেসকো গণযালা। তিনি ছিলেন সেনাধ্যক্ষ। ফোরনোভো যুদ্ধে তিনি ইতালিয় বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।

মার্সিনাস ও পিলিয়াস Macrinus Opilius (১৬৫-২১৮ খ্রি)

৮ এপ্রিল ২১৭ থেকে ৮ জুন ২১৮ এই একবছর দুই মাস রোমের সম্রাট ছিলেন। অত্যন্ত গরিব ঘর থেকে উঠে আসা মার্সিয়াস সেভেরাসে চাকরি করে ক্রমে কারাসেল্লার প্রধান ব্যক্তিতে পরিণত হন। প্রভুর মৃত্যুর পর নিজেকেই তাঁর উত্তরাধিকার ঘোষণা করে সিংহাসনে বসেন। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি হেলিও জাবালাস বাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

মেসসের বার্নাবো Messer Bernabo (১৩২৩-১৩৮৫ খ্রি)

দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে মিলানেস-এর শাসনকাজ পরিচালনা করেন দীর্ঘ একত্রিশ বছর (১৩৫৪-১৩৮৫)। ১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত, বন্দি এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র জিয়ান গ্যালেয়াজোর হাতে নিহত হন।

ম্যাক্সিমিলিয়ান Maximilian (১৪৫৯-১৫১৯ খ্রি)

সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডেরির পুত্র এবং উত্তরাধিকার। ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে রোমের সম্রাট নির্বাচিত হলেও সিংহাসনে বসতে পারেননি। ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় জুলিয়াসের অনুমতিক্রমে নির্বাচিত সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি পান। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় কূটনৈতিক চালে। যার উদ্দেশ্য ছিল হাবসবার্গস-এ ইউরোপীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠা। তিনি ছিলেন স্বার্থক এবং যোগ্য শাসক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সুদূর প্রসারী। ফলে তাঁর শাসনামলের শেষ পর্যায় সুখের ছিল না। দ্বাদশ লুইসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলে তা ব্যর্থ হয়। সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের কারণেই তাঁর এই পরিণতি।

যেনোফেন Xenophon (খ্রিপূ ৪৩১-৩৫০)

খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকের এথেন্সের অধিবাসী। ৪০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাইরাসের নেতৃত্বে আরটাজারজেস-এ পরিচালিত সেনা অভিযানে তিনি গ্রিক বাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। গ্রিক বাহিনীর ঐতিহাসিক পশ্চাতপসরণে তিনি নেতৃত্ব দেন। এনাবাসিস-এ তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল রেখে যান।

রবের্টা সান সেভেরিনো San Severino, Ruberta

নেপোলিয়ান ব্যারনের জারজ সন্তান। লামবার্ডির যুদ্ধে তিনি ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করেন। ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে ভেনেটিয়ান বাহিনীর কমান্ডার নিয়োজিত হন। পরে তিনি পোপের কার্যালয়ে কাজ করেন। ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে ভেনিস যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

রানি জোয়ান্না Queen Joanna (১৩২৬-১৩৮২ খ্রি)

ন্যাপল্‌স-এর দ্বিতীয় রানি। তিনি ছিলেন খুব দুর্বল শাসক। তাঁর শাসন কাল ১৪১৪ থেকে ১৪৩৫। এই দীর্ঘ সময় ন্যাপল্‌স কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। প্রথম তিনি আরাগনের রাজাকে তাঁর উত্তরাধিকার নির্বাচন করেন। পরে তিনি মত পরিবর্তন করে আনজোউ-র লুইসকে উত্তরাধিকার নির্বাচন করেন। যাকে পোপ সমর্থন জুগিয়েছিলেন। ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। স্ফোর্জা এবং ব্রাক্কিও পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি নিঃসন্তান মৃত্যু বরণ করেন। ক্রমে তার রাজ্য আরাগোনেসের অধীনে চলে যায়।

রেমিরো ডি ওরকো Remirro De Orco

অন্য নাম র‍্যামিরো ডি লোরকোয়া। তিনি ছিলেন সিজার বর্জিয়া-র 'বাজার সরকার'। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে সিজার বর্জিয়া তাকে ফ্রান্স নিয়ে যান। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে রোমাগনার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। পরের বছর তাকে নিজের ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

রোমুলাস Romulas (খ্রিপূ ৭৭১-৭১৭)

রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রবাদপ্রতীম পুরুষ রোমুলাস। রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যমজ ভাইদের অন্যতম তিনি। আর এক ভাই রেমুস। তারা ছিলেন মার্স এবং রেহা সিলভিয়ার সন্তান। জন্মের পর নিজের অধিকার হারানোর ভয়ে এঁদের দাদা (চাচাতো) এমুলিয়াস গোপনে দুই ভাইকে তিবের নদীতে নিক্ষেপ করেন। এক দরিদ্র মেষপালক তাদের উদ্ধার করেন। তারা মায়ের দুধ পান করার পরিবর্তে মেষের দুধ পান করে বড় হতে থাকেন। পরে তারা তাদের আপন ঠাকুরদা নুমিটারের সন্ধান পান ও ক্ষমতায় আসীন হন। ক্ষমতায় বসে নদীর তীরে যেখানে তাদের উদ্ধার করা হয়েছিল সেখানে একটি নগর নির্মাণ করেন। রোমুলাস নগরের প্রাচীর নির্মানের সময় রেমুস সেখানে উঠলে ভাইয়ের হাতে নিহত (খ্রিপূ ৭৫৩) হন। নগরীর নামকরণ করা হয় রেমুলাসের নামে। এক প্রবল ঝড়ে নগরী ধ্বংস না-হওয়া পর্যন্ত রোমুলাসই ছিলেন এর শাসক। রোমানরা তাকে দেবপুরুষ কল্পনা করে রোমের প্রতিষ্ঠাতা বলে পূজা করে।

লরেঞ্জো ডি মেডেসি Lorenzo de' Medici (১৪৪৯-১৪৯২)

পুরো নাম লরেঞ্জো ডি পিয়্যারো ডি মেডেসি। মহান লরেঞ্জে বা লরেঞ্জো দ্যা ম্যাগানিফিসেন্ট উপাধীতে বিশেষ পরিচিত। ইতালির নজজাগরণের কালে তিনি ফ্লোরেন্সের শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকাল ২ ডিসেম্বর ১৪৬৯ থেকে ৯ এপ্রিল ১৪৯২ পর্যন্ত। বাবার মৃত্যুর পর কুড়ি বছর বয়সে তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন। ইতালির দক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর নাম জগত জোড়া। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোরেন্সের স্বর্ণযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়। ফ্লোরেন্সেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মেকিয়াভেলি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ *দ্য প্রিন্স* উৎসর্গ করেন লরেঞ্জো ডি মেডেসিকে। কেবল উৎসর্গ নয় গ্রন্থ পাঠে মনে হয় মেকিয়াভেলি লরেঞ্জোকে উদ্দেশ্য করেই এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের একেবারে শেষের দিকে লেখক লরেঞ্জোকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন : 'না হে মহৎ লরেঞ্জো, বর্তমানে আপনার ওই বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছাড়া বিশ্বাস রাখা যায় এমন আর কেউ নেই।'

লিও দশম Leo X (১৪৭৫-১৫২১ খ্রি)

দশম লিও ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন লরেঞ্জো ডি মেডেসি-র পুত্র। তার পুরো নাম কার্ডিনাল জিওভেনি ডি মেডেসি। তিনি ছয়জন নিকট আত্মীয়কে কার্ডিনাল (উচ্চপদস্থ যাজক) নিযুক্ত করে মেডেসি পরিবারকে দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করানোর উদ্যোগ নেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আপন ভাইয়ের ছেলে লরেঞ্জোকে আরবিনোর ডিউক নির্বাচন করেন। প্রাথমিকভাবে দ্বিতীয়

জুলিয়ানের ফ্রান্স নীতির বিরোধিতা করলেও পরে তিনি প্রথম ফ্রান্সিসের সঙ্গে চুক্তি করেন। তিনি শিল্প-সাহিত্যের গুণগ্রাহী ছিলেন। পোপের পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় লুথার অসংজমের বিপক্ষে তাঁর পঁচানব্বইটি থিসিস প্রকাশ করে।

লুইস একাদশ Louis XI (১৪২৩-১৪৮৩ খ্রি)

১৪৬১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা সপ্তম চার্লেস এর মৃত্যুর পর তার পুত্র একাদশ লুইস রাজা হন। ক্রমে ফরাসি রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করতে সমর্থ হন। সুইজারল্যান্ড থেকে সেনা সংগ্রহের চুক্তি করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন। ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ১৪৮৩-র ৩০ আগস্ট তার মৃত্যু হয়।

লুইস দ্বাদশ Louis XII (১৪৬২-১৫১৫ খ্রি)

চার্লেস দ'ওরলিয়ানস-এর পুত্র অষ্টম চার্লেস-এর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধীকার হিসেবে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন দ্বাদশ লুইস। ক্ষমতায় বসেই তিনি মিলান এবং ন্যাপল্‌স-এর উপর অধিকার দাবী করেন এবং অতি দ্রুত তা নিশ্চিত করেন। প্রথমেই ষষ্ঠ আলেকজান্ডারের সঙ্গে দরকষাকষি করে স্ত্রী একাদশ লুইসের কন্যা জেনিকে ত্যাগ করেন এবং চার্লেসের বিধবা পত্নিকে বিয়ে করেন। যাকে চার্লেস-এর স্ত্রীর সঙ্গে যৌতুক হিসেবে এনেছিলেন। মিলানেস ভূখণ্ডের ভাগাভাগির জন্য ভেনিসের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে শেষ হলে তিনি মিলান অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে লুইস ন্যাপল্‌স সমস্যা সমাধানের জন্য স্পেনের সঙ্গে গোপন চুক্তি করেন কিন্তু পরের বছরই ফ্রান্স ন্যাপল্‌স আক্রমণ করে বসে। ফলে দুই পক্ষ বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্স গ্যারিগলিয়ানো দখল করে নেয়। কয়েক বছর পর লুইস পোপ, স্পেন এবং ভেনেটিয়ান ভূখণ্ডের এক অংশের সম্রাটের সঙ্গে (১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে) চুক্তিবদ্ধ হন। ভ্যালিকা যুদ্ধে ফরাসি বাহিনী ভেনেটিয়াসদের পুরোপুরি পরাজিত করে। ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রথম ফ্রান্সিসকো লুইসকে পরাজিত করেন। তিনি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আলপস দখল করে নেন।

লুকা (বিশপ) Bishop Luca

মেকিয়াভেলি যাকে 'প্রি' 'লুকা' বলেছেন তিনি লুকা রেইনালভি। 'Pri' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে 'priest' বা 'prete'-র সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে। লুকা সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের দূত হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন।

লুডোভিকো Ludovico (১৪৫২-১৫০৮ খ্রি)

মিলানের ডিউক ফ্রান্সেসকো স্ফোর্জা এবং বিয়ানকা মারিয়া ভিসকনটির সন্তান লুডোভিকো ল্ মোরো। জিয়ান গ্যালেয়াজোর অন্তর্বর্তি শাসনের পর ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে মিলানের শাসনভার গ্রহণ করেন। ফেরারার ডিউকের মেয়ে বিয়াট্রিস দ'এস্টেকে বিয়ে করে নিজেকে দৃঢ় অবস্থানে নিয়ে যান এবং ন্যাপল্স ও ফ্লোরেন্স-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। আরাগনের ইসাবেলার সঙ্গে জিয়ান গ্যালেয়াজোর বিয়ে হলে ন্যাপল্স-এর পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করে এবং লুডোভিকোকে ফ্রান্সের দিকে ঠেলে দেয়। অন্য দিকে লুডোভিকো অষ্টম চার্চের সহায়তা লাভ করেন। জিয়ান গ্যালিয়াজো নিহত হলে তিনি নিজেকে ডিউক ঘোষণা করেন। কথিত আছে লুডোভিকোই গ্যালিয়াজোকে হত্যা করেছিলেন। এক সময় ফ্রান্সের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। ফ্রান্সের একটি ক্ষুদ্র সেনা দলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে। বন্দি হন ফরাসি বাহিনীর কাছে। বাকি জীবন তিনি ফ্রান্সের কারাগারেই কাটান।

সউল Saul

ইসরাইলের প্রথম রাজা। সম্ভবত ১৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি রাজত্ব করেন।

সাইরাস Cyrus (খ্রিপূ ৬০০/৫৭৬-৫৩০)

ফরাসি সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মহান সাইরাস নামে ইতিহাসে খ্যাত। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩০ অব্দে এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

সান জিওরজিও San Giorgio

আসল নাম স্যাভোনার কার্ডিনাল রাফায়েলো। এঁর সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায়নি।

সান পিয়েট্রো এড ভিনকুলা San Pietro ad Vincula

দেখুন দ্বিতীয় জুলিয়াস।

সিজার বর্জিয়া Cesare Borgia (১৪৭৫-১৫০৭ খ্রি)

কার্ডিনাল রডরিগো বর্জিয়া এবং তাঁর রক্ষিতা ভ্যানোজা ক্যাটানেই-র সন্তান সিজার বর্জিয়া ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে রোমে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কখনো পুরোহিত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তাকে উপাসনালয়ের উচ্চাসনে বসান হয় ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে। ষষ্ঠ আলেকজান্ডার এবং দ্বাদশ লুইসের মধ্যে শান্তির চুক্তি সম্পাদনের জন্য ফ্রান্স যাত্রার আগে তিনি এই পদ ছেড়ে দেন।

এর পর তিনি ভ্যালেন্স-এর ডিউক নিযুক্ত হন এবং রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিয়ে করেন। রোমাগনা অভিযানে লুইস তাকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ১৫০১-এ

সিজার ফ্যানো, পেসাবো, রিমিনি, সেডোনা, ফোরলি, ফায়েনজা এবং ইমোলো এই সাতটি নগর দখল করেন। এর পুরস্কার হিসেবে পোপ তাকে রোমাগনার ডিউক নিযুক্ত করেন। পরের বছর পোপ ক্যামেরিনো এবং আরবিনো অধিকার করার পরিকল্পনা করেন। একটি সার্থক অভিযানের পর সিজার তার নিজের বাহিনীর বিদ্রোহের মুখে পড়েন। সিজার দক্ষতা, যোগ্যতা এবং নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করেন। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সিজারের রাজ্য চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে পড়ে। যদিও রোমাগনা তাঁর অধীনেই ছিল। অনেক বীরত্বপূর্ণ এবং দুঃখজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। মেকিয়াভেলি তাকে সীমিতভাবে দেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন মেকিয়াভেলি বিশ্লেষক জর্জ বুল।

সিক্সটাস Sixtus (১৪১৪-১৪৮৫ খ্রি)

১৪৭১ খ্রিস্টাব্দে পোপের দায়িত্ব পান। তিনি ছিলেন চতুর্থ পোপ। তাঁর জ্ঞাতি ভাই জিউলিয়ানো ডেল্লা রোভেরে ছিলেন পরবর্তীকালের পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস। সিক্সটাস ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।

স্কিপিও আফ্রিকানাস Scipio (খ্রিপূ ২৩৪-১৮৩)

খ্যাতিমান রোমান সেনাধ্যক্ষ। স্পেন ও আফ্রিকার সফল অভিযানে হান্নিবাল অধিকার করে নেন। দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে রোম ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

স্টেপটিমিয়াস সেভেরাস L. Septimius Severus (১৪৫-২১১ খ্রি)

রোমান সম্রাট ১৯৩ থেকে ২১১ খ্রিস্টাব্দ। জন্ম ১৪৫ খ্রিস্টাব্দে। মার্কাস আউরেলিয়াস এবং কমোডাস-এর কাছে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেনা বাহিনীর বলে বলিয়ান হয়ে ১৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইলিরিয়া রোমের আধিপত্ত দাবি করেন। জুলিয়ানের মৃত্যুর পর পেসেলিয়াস নিগারকে পরাজিত করেন। যিনি ১৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে রোমের সিংহাসনে বসেন। দু'বছর পর গাউলের সম্রাট ক্লোডিয়াস আলবিনাসকে পরাজিত করেন। এবোরাকামে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

স্ফোর্জা Sforza

ফ্রানসেসকোর পিতা। পুরো নাম মুজিও এটেনডেলো স্ফোর্জা (১৩৬৯-১৪২৪)। আলবেরিকো দা বারবিয়ানোর কাছে প্রতিপক্ষের মতো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নেপলেস-এ জোয়ানায় চাকরিরত অবস্থায় তিনি নিহত হন।

হিয়েরো সাইরাকাসের Hiero of Syracuse (খ্রিপূ ৩০৮-২১৫)

সাইরাসের দ্বিতীয় হিয়েরো। অভিজাত পরিবারের হিয়েরো খ্রিস্টপূর্ব ২৭০ অব্দে শাসক নির্বাচিত হন। মেসিনার ম্যামেরটিনেসের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে বসেন। প্রথম পিউনিক যুদ্ধের শুরুতে কারথাজিনিয়ানদের সমর্থক ছিলেন। পরে তিনি রোমানদের সঙ্গে সন্ধি করেন। 'জাস্টিন' থেকে মেকিয়াভেলি তার বিবরণ সংগ্রহ করেছেন বলে জানা যায়।

হেলভিয়াস পার্টিন্যাক্স Helvius Pertinax (১২৬-১৯৩ খ্রি)

১৯৩ খ্রিস্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য রোমান সম্রাট ছিলেন। কমোডাসের মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতায় বসেন। সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং অন্যান্য সংস্কার কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিজের সেনাবাহিনীর একাংশের হাতেই তিনি নিহত হন।

হেলিওগাবালাস বা এলগাবালাস Heliogabalus or Elagabalus (২০৩-২২২ খ্রি)

রোমান সম্রাট ছিলেন ২১৮ থেকে ২২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ছেলেবেলায় সূর্যদেবতা হেলিওগাবালাস পূজার জন্য তাকে একজন যাজক নির্বাচিত করা হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে তাঁকে এই নামে ডাকা। মাত্র তের বছর বয়সে সম্রাটের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। একজন বোকা এবং নিষ্ঠুর শাসক হেলিওগাবালাস নিজ সেনাবাহিনীর হাতেই নিহত হন।

হ্যানিবল Hannibal (খ্রিপূ ২৪৭-২১৮)

হ্যামিলকারের পুত্র। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ২২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই তিনি কারথাজিনিয়ান বাহিনির কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় পিউলিক যুদ্ধে তিনি ইতালি আক্রমণ করেন কিন্তু রোম দখলে ব্যর্থ হন। পরে তিনি আফ্রিকান যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। ফলে চারথেস থেকে পালাতে বাধ্য হন। রোমানদের হাতে ধরা পরার মুহূর্তে বিষ পান করে তিনি আত্মহত্যা করেন।

হ্যামিলকার Hamilcar

প্রথম পিউনিক যুদ্ধে ২৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হ্যামিলকার বার্কা সিলির কারথাজিনিয়ান বাহিনীর কমান্ডার নিয়োজিত হন। এর বেশি তার সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি।

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তিনাম

আগাথোক্লেস : ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১
আন্নিবল : ৭৫, ৭৬
আলবা : ২৯
আলবিনাস : ৭৯
আলেকজান্ডার (মহান) ২৩, ২৪, ২৫, ৫৯, ৬২, ৯৫
আলেকজান্ডার: ৬৬, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮২
আলেকজান্ডার (ষষ্ঠ): ২০, ২১, ২২, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪৮, ৪৯, ৭২
আলেকজান্ডার ভ্যালেনটিনো : ৪৯
অ্যাসকানিও : ৩৭

ইপামিনোনডাস : ৫২

এন্টিওকাস : ১৮, ১৯, ৮৮
এচিলেস : ৭১
এন্টেনিনাস : ৭৭, ৭৮
এন্টেনিনাস কারাসেল্ল-া : ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০
এন্টেনিও ভেনাফ্রো : ৯১

ওলিভেরোট্টো : ৩৯, ৪০

কার্ডিনাল সান পিয়েট্রো : ৩৭
কেমোরিনো : ২০
কন্‌তে দ্য পিতিলিয়ানো: ৫৪
কিং ভ্যানেটিয়ার : ৩২
কোলোনা : ৪৯
কমোডাস : ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮২
কাউন্ট জিরোলামো : ৮৬
কারমিগনুওয়াল : ৫৪

গ্রাচি : ৪৪
গোলিয়াথ : ৫৭
গুইডোব্যালডো : ৮৫

চার্লেস (অষ্টম) : ১৯, ২০, ৫২
চার্লেস (সপ্তম) : ৫৮

জন স্পারপি : ৫৩
জিওভ্যানি : ৪০, ৫৩, ৭৫,৭৭
জুলিয়াস (দ্বিতীয়) : ৬৫, ৮১, ৯৮
জুলিয়াস সিজার : ৬৬
জুলিয়ান : ৭৭, ৭৯
জেনোয়া : ২০
জিওভেন্নি বেন্টিভোগনি : ৯৮

টাইটাস কুইনটিয়াস : ৯৫

ডন র‍্যমিরো দ্য আরকো : ৩৪
ডারিয়াস : ২৪
ডিউক ভ্যালেনটিনো : ২২, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৭
ডিউক অব মিলান : ২৮, ৪৮, ৬০
ডিউক ফারেনজো : ৩৩
ডি এ্যামকোইস : ৩৭
ডিউক অব ফেরারা : ১৪, ২০
ডিউক ভ্যালিনটিনো : ৫৭
ডেভিড : ৫৭, ৫৮
ডিডো : ৬৮